আত্মজা ও একটি করবী গাছ

হাসান আজিজুল হক

এখন নির্দয় শীতকাল, ঠাণ্ডা নামছে হিম, চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায়। অল্প বাতাসে একটা বড়ো কলার পাতা একবার বুক দেখায় একবার পিঠ দেখায়। ওদিকে বড়ো গঞ্জের রাস্তার মোড়ে রাহাত খানের বাড়ির টিনের চাল হিমঝকঝক করে। একসময় কানুর মায়ের কুঁড়েঘরের পৈঠায় সামনের পা তুলে দিয়ে শিয়াল ডেকে ওঠে। হঠাৎ তখন স্কুলের খোয়ার রাস্তার দুপাশের বনবাদাড় আর ভাঙা বাড়ির ইঁটের স্তূপ থেকে হু-উ-উ চিৎকার ওঠে। ঈশেন কোণ থেকে ধর ধর লে লে শব্দ আসে, অন্ধকার—ভূত অন্ধকার কেঁপে কেঁপে ওঠে, চাঁদের আলো আবার ঝিলিক দেয় টিনের চালে। গঞ্জের রাস্তার ওপর উঠে আসে ডাকু শেয়ালটা মুখে মুরগি নিয়ে। ডানা ঝামড়ে মুমুর্ষু মুরগি ছায়া ফেলে পথে, নেকড়ের মতো ছায়া পড়ে শিয়ালটারও, চাঁদের দিকে মুখ তুলে চায় সে, রাস্তা পেরোয় ভেবেচিন্তে—তারপর স্কুলের রাস্তার বাদাড়ে ঢোকে। হাতে লাঠি চাঁদমণির বাড়ির লোক ঠ্যাঙাড়ের দলের মতো হল্লা করে রাস্তায় পড়ে—কোনদিকি গেল শালার শিয়েল, কোনদিকি ক দিনি।

আরো হিম নামে।

বড়ো পুলের ওপর থেকে নিচের পানিতে আপন ছায়া দেখতে চায় সরদারদের ছোটো তরফের বড়ো ছেলে ইনাম। পানির রুপোলি মেঝেয় হাতড়ে বেড়ায় নাক-মুখ। হিম নামে যেন শব্দ করে, বাতাস আসে শির-শির, খড়মড় উড়ে যায় বাদাম খোলা। খাদের আসশ্যাওড়ার পাতা থেকে আলো চলকে ওঠে, কাঁঠাল গাছের পুবদিকের ডাল হাত নাড়িয়ে ডাকতেই থাকে বিচ্ছিরি। অজস্র খঞ্জনি বেজে ওঠে ঝনঝন।

ইনাম পুল ছেড়ে ধুলো ভেঙে শুকনো বিলের কিনারায় দাঁড়ায়। সেখানে শঙ্খচূড়ের মতো দেখায় যে ধবল পথটা এখন তা ত্রস্ত হয়ে এলো, ফেকুর বাঘের মতো শরীরটা দেখা গেল, তার পেছনে সুহাস। ওরা খুব গল্প করছে। যে জন্যে এখানে এখন এত রাতে সে সম্বন্ধে কোনো কথা নেই। কখন সুহাস ছোটো মামার বিয়ের বরযাত্রী গিয়েছিল, অমৃতের মতো পুরী খেয়েছিল আর অঢেল মিষ্টি সেই গল্প। ট্রানজিস্টরটা বেজেই যাচ্ছিল ফেকুর বগলে, ওরা কেউ

শুনছিল না, কণিকা বিলের কিনারায় দারুণ ঠাণ্ডায় বৃথাই গাইছিলেন অন্ধকারে একা থাকার যন্ত্রণা। বিনিয়ে বিনিয়ে। আর আশ্চর্য, একটা পাখিও ডাকছিল না। রেডিওডা বন্দ করে দে—ওদের দেখে ইনাম বলল। অসহ্য লাগছিল তার। আইছিস—দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা দুজনে। সুহাস হাসল, বিড়ির ধোঁয়ায়-কালো দাঁতগুলো প্রায় মুখের বাইরে চলে এলো। ইনামের আবার অসহ্য লাগল। রেডিওডা বন্দ করে দে—বলল সে। কেউ শোনপে না, শোনলেও এদিকি আসবেনানে কেউ, ফেকু বলল। সেজন্যি বলতেছি না, খারাপ লাগতেছে গানডা। কণিকার গলা টিপে দিল ফেকু। এখন চল, দেরি করলি ঘুমিয়ে পড়বেনে আবার, ফেকু বলল আর ট্রানজিস্টরটা সুহাসের হাতে দিল। সেটা নিতে নিতে সুহাস প্রশ্ন করে, কেডা? বুড়োটা আবার কেডা! সন্ধে হলি ঘুমিয়ে পড়বে কেশো বুড়ো—থু করে থুথু ফেলে বলে ফেকু।

যেতে যেতে বাতাস বেড়ে গেল একটু—ফাঁকা বিল থেকেই আসছিল বাতাসটা। শুকনো পাতার শব্দ হচ্ছিল। ঝপ করে মাছ লাফিয়ে উঠল কাজীদের পুকুরে আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল খাঁদের বাড়িতে ধান সেদ্ধ হচ্ছে উঠোনে। উনুনের আগুন দপ করে জ্বলে উঠলে খাঁদের সুন্দর সুন্দর মেয়েদের মুখ একবারের জন্যে ঝলসে উঠল। ইস্কুলি যাতিছিস না আজকাল? সুহাস জিগ্‌গেস করে। না—ইনাম জবাব দেয়। পড়বি না আর? না, পড়লি আমারে কেউ সিন্নি দেবে ক! চাকরি করবি। হয়, চাকরি গাছে ফলতিছে। সুহাস আর কিছু বলে না। ট্রানজিস্টরটা নিয়ে খুচরো শব্দ করে শুধু আর বেঢপ বুটজুতো দিয়ে ধুলো ছড়ায়। নাকে ধুলো এসে লাগতেই রুখু গন্ধ পাওয়া যায়। ইনামের বিকেলের কথা মনে পড়ে, হাটবারের কথা, মাছের কথা। মাছ থেকে নদী। নদী এখন প্রায় শুকনো, চড়া পড়ে গেছে। গরুর গাড়িতে লোক বালি আনছে নদী থেকে। বাঁকের কাছে কাশ হয়েছে। এ পাড়ে স্কুলবাড়ি, বড়ো সজনে গাছে ফিঙে, তার লম্বা লেজের দুলুনি। স্কুলের পেটা ঘড়ি ভেঙে গেলে এক টুকরো রেল ঝুলিয়ে লোহার ডাণ্ডায় ঘনাৎ ঘনাৎ আওয়াজ—হুড়মুড় করে হেডমাস্টার...শালার জোকার একডা, বই বগলে মাস্টার তারাপদ, তার পাকানো চাদর, আধভাঙা দাঁত আর মুখে কথার ফেনা। এইসব মনে পড়ল। ঝর ঝর করে ছবিগুলো এলো ; যেন দক্ষিণ বাতাসে নিমের হলুদ শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে, আর ছবিগুলো চলে গেল যেন ট্রেনটা যাচ্ছে পুল পেরিয়ে, মাঠের বুক চিরে আর ন্যাংটো ছেলেটা দাঁড়িয়ে দেখল। ছবিগুলো পেরিয়ে যেতেই খেয়াল হল সুহাস সেই গল্পটা আরও তোড়জোড় করে বলছে, ছোটো মামার বিয়ের বরযাত্রী যাবার গল্প। ওর একটা কথাও শুনছে না ফেকু, সে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। চাঁদের আলোর মধ্যে দেশলাইয়ের আগুনটা

দেখালো ম্যাড়মেড়ে আর ফেকুর বিতিকিচ্ছি মুখটা দেখা গেল, কপালের কাটা দাগটা, মুরগির মতো চোখ, নিচে ঝোলানো ঘোড়ার মতো কালো ঠোঁট। খাবি নাহি? ফেকু জিগ্‌গেস করে। সুহাস গল্প থামিয়ে সিগারেট নেয়, দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যাওয়ায় আর একটা জ্বালায়। সুহাস তারপর আবার গল্প শুরু করে, লঞ্চে যাতি হয় তো, মধুমতী নদী দিয়ে—অন্ধকারের মধ্যি গেলাম—দুপাশে গেরাম না কি কিডা জানে—মনে হচ্ছিল সোন্দরবন। এমন অন্ধকার আর এমন জোঙ্গল বুজিচো? ইনামের মনে হলো সুহাস গতকাল থেকে গল্পটা বলছে আর আগামীকাল পর্যন্ত বলবে। নাপিত বিটা কমিয়ে কতি পারে না? একেবারে অসহ্য লাগলে এইকথা ভাবল ইনাম। সুহাসের গল্পে একশোটা পল্লব—ছোটো মামার চেহারার বর্ণনা, বিয়ের সম্বন্ধ, পাত্রীর খোঁজ, পাত্রীর কাকার সঙ্গে ছোটো মামার বাবার ঝগড়া, বিয়ের দিন ধোপাবাড়ি থেকে সিল্কের পাঞ্জাবি ভাড়া নিয়ে আসার ঝকমারি—কিচ্ছু বাদ দিচ্ছিল না সে—তাই ইনাম খেপে গিয়ে বলল, তোর ছোটো মামা বিয়ে করতি গিলো ক্যানো ক তো? সুহাস কান দিল না ; সকালের সূর্য উঠতি মধুমতী ঝকঝক করতিছে, জ্যাঠামশাই ধপ করে কাদায় পড়িলো লঞ্চ থেকে নামতি গিয়ে আর মামীর বোনেরা যা সোন্দর সে আর কলাম না। তোর মামার বাড়িটা কোয়ানে মামার শালীরা বেড়াতে আসলি কস আমাকে—ফেকু কথা না বললেই নয়, তাই বলে। সেটি হচ্ছে না, বুজিচো—চোখ বন্ধ করে মনের আরামে বলল সুহাস। ও, তাই তুমি মাসে পাঁচবার করে ছোটো মামার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতি যাচ্ছো? বুজিচি, ওখেনে তো পয়সাকড়ি লাগে না ; আরামেই আছো দেহা যায়—ফেকু চোখ মটকে বলে।

রাহাত খানের টিনের চাল দেখা যাচ্ছে না আর, পুল কোথায়, বিল সরে গেছে কখন। চাঁদমণির বাড়ির লোকজন চুপ করে গেছে। একটা মুরগির শোক আর কতক্ষণ থাকে। কাল হয়তো বসু বাবুদের ইঁটখোলায়, না হয় সরকারদের পড়ো বাড়ির ভেঙে-পড়া সিঁড়ি ঘরের মধ্যে বেচারির চকচকে পালক, হলদে ঠ্যাং কিংবা ঠোঁটের টুকরো পাওয়া যাবে। চাঁদমণির বাড়ির লোকজন কাজেই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু বুড়িটা বসে আছে, ফাটা পায়ে তেল ঢালছে আর পিদিমটা কেন নিভছে না তা পিদিমটা ছাড়া আর কেউ জানে না। কি ঠাণ্ডারে বাবা—বউ, অ-বউ আর একটা খ্যাঁতা দে, মরে গেলাম, হেই বউ। বউটা কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমোচ্ছে, ছেলেটা বকছে বিড় বিড় করে, মরে যাচ্ছে না ক্যানো কেডা জানে! বুড়ি আর একবার চেঁচায়, কিন্তু হঠাৎ হাওয়াটা ওঠে, সুমসাম শব্দ জাগে, বুড়ির কাঁপা গলা কেউ শুনতে পায় না। এইরকম জীবন চলতে থাকে। ফেকু ঠোঁটে কুলুপ দেয়, সুহাস হঠাৎ ট্রানজিস্টরের চাবিটা ঘট করে খুলেই বন্ধ করে, ইনাম মাথা নিচু করে ভাবতে থাকে।

রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর পা ঠুকে ধুলো ঝাড়ে ওরা। পাশের গলি-পথটায় ঢোকার সাথে সাথে জাপটে ধরে অন্ধকার আর সপাং করে চাবুক চালিয়ে দেয় কি একটা লতা। ফেকুর ঠোঁট খোলে, জঘন্য একটি গাল দিয়ে ওঠে লতাটিকে। তারপর শান্ত হয়ে গল্প শুরু করে, শালা, আজকাল এতো বেশি ধরা পড়তিছি ক্যানো কতি প্যারিস? এই কথায় সুহাসের চোখদুটি চকচক করছে কৌতূহলে, একটা কথা কই, কিছু কবি না ক? ফেকুর সম্মতির অপেক্ষা না রেখে সে বলে, অত মার খাস কি করে, আমাকে বলতি পারিস? শালার দাদা এক চড় মারলি চোহে অন্ধকার দেখি। মার খাওয়াডা শিখতি অয় বুঝিচো বাপধনু—ওস্তাদের কাছে শিখতি অয়। লেহাপড়ার জন্যি ইস্কুলি যাতি অয় যেমন, তেমনি—ফেকু বলে। ইনামের আবার অসহ্য লাগে, ইস্কুলি লেহাপড়া বিয়োচ্ছে, বিটার শালার মাস্টাররা—ইনাম এমন কথা বলে যা মুদ্রণযোগ্য নয়। ফেকু তখন বলছে, ইস্টুপিট হলি আর মার খাতি না জানলি মানুষের পহেটের কাছে যাতি নেই পহে-টথে ট্যাহা বারোয়ে থাকলিও না। টাকার কথা শুনে ইনাম অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ল। টেণ্ডু ড্রাইভারের কথা শুনে একবার ভিড়ে হাত দিয়েছিল বঁটিমুখো এক ভদ্রলোকের পকেটে। কাগজ খড়মড় করে উঠল আর এমন শব্দ উঠল যে মনে হলো কানে তালা লেগে যাচ্ছে। অ্যাও বলে গড়র গড়র গর্জন করে উঠল লোকটা। কিন্তু আসলে ভদ্রলোক গলা ঝাড়ছিল। কাজেই ইনামের কাছে পয়সা নেই। নারকেল চুরি করে বিক্রি করলে হয়—কিন্তু ভাতের চালের অভাবে উপোস করে থাকতে বড়ো কষ্ট।

পথটায় অন্ধকার থকথক করছে। মাথার ওপর বাঁদিকের লতা ডানদিকে চলে গেছে জাল বুনতে বুনতে। গল্পের ঝোঁকে ফেকু সুহাসের ওপর এসে পড়ে আর সুহাস চিৎকার করে, উরে, মরিছিরে বাপ। ফেকু বলে, দেহিস রেডিওডা ফালাসনা।...সেদিন কি হলো ক দিনি, এক বাস লোক—বাস যাচ্ছে চল্লিশ মাইল পঞ্চাশ মাইল স্পীডি, সামনের লোকটার পাঞ্জাবির পহেটথে নোটগুলো বারোয়ে আছে—হাত দিতি খপ্ করে ধরে ফেলল। তারপর উরে মার, ভাগাড়ে যেন গরু পড়িছে। কপালের ঘা শুকোয়নি এহনও। এইবার গুণ্ডোটা শুরু করিছে—ইনাম ভাবল। গল্প শুনতে শুনতে সুহাস ট্রানজিস্টরটা চালিয়ে দেয়, গর্জন করে ওঠে সেটা। আওয়াজটা কিম্ভুত শোনা যায় ঠাণ্ডা আর স্তব্ধ অন্ধকারে। সুহাস থুথু ফেলে বলে, শালা খ্যাল গাতিছে—বলেই চাবি বন্ধ করে এবং 'তুমি যে আমার জীবনে এসেছ' ধরে দেয়। ভিটে থেকে একটা কুকুর উঠে এসেছে—ক্ষীণ চিৎকার করার চেষ্টা করছে। গলা যখন ফুটল না ইনামের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সমস্ত পাছাটা দোলাতে শুরু করে। নড়েচড়ে গরম হতিছ শালা—। ফেকু মন্তব্য করল এবং কেন তার জীবন নষ্ট হলো, কে কে নষ্ট করল আর

পকেট মারার কৌশল, তার নিজস্ব নৈপুণ্য, সাফল্য আর পিটুনি খাওয়ার অভিজ্ঞতা বলেই যেতে লাগল। কবরটা কি কতি পারিস? লেহাপড়া শিখলি না হয়—। লেহাপড়ার মুহি পেচ্ছাপ—ইনাম বলল। আবার অসহ্য লাগল ওর। তাহলি—ফেকু ভেবেচিন্তে বলল, উঁচো জায়গায় দাঁড়ায়ে সবির ওপর পেচ্ছাপ। কাজ কোয়ানে? জমি নেই খাটি, ট্যাহা নেই ব্যবসা করি—কি কলাডা করবানে?

পাখিদের কোনো গান নেই এখন। শব্দ যা শোনা যাচ্ছে চাপা। কুয়াশা আর হিম জড়িয়ে আছে ওদের। সামনে বিড়ালটা যখন পার হয়ে গেল, শুধু দুটি জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল তার। সুহাস ফেকু ইনাম কথা বন্ধ করেছে। সুহাসের বগলে ট্রানজিস্টর, ফেকু মাফলার মুখের ওপর জড়িয়ে নিল, ইনাম হাতে হাত ঘষে একটু গরম করতে চেষ্টা করল। ডাইনে পালদের বাড়ি মাটির হাঁড়িকুড়ি তৈরি করে, পরিচয় জিগ্‌গেস করলে রাস্তা থেকে হেঁকে জবাব দেয়, পালমশাই ; তাদের বাড়ির পলেস্তরা-খসা দেয়াল, কারণ বাড়িটা আসলে সেনদের। ওরা চলে গেছে পঞ্চাশে। বাতাবিলেবু গাছটার পাশ দিয়ে যেতে চড়াৎ করে একটা পাতা ছেঁড়ে ইনাম আর ঠাণ্ডা উঠোনটার দিকে চেয়ে থাকে। পোড়ামাটির গন্ধ নাকে লাগে, কালো জালাগুলো ছড়িয়ে আছে দেখা যায়, ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘুম-জড়ানো গোঙানি ভেসে আসে। সব ঘুমোয়ে পড়িছে—সুহাস বলে। ফেকু সায় দেয় ঘোঁৎ করে। আজ না আসলিই হতো—সুহাস অভিযোগ করতে থাকে, ভয় করতিছে আমার। ফেকু ভ্যাংচায়, ভয় করতিছে, কচি ছ্যামরা, দুধু খাবা! সুহাস বলেই চলে, বুড়োরে দেখলি আমার ভয় করে। একবার মনে হয় মরে যাবেন এহুনি, একবার মনে হয় আমাদের সব কডারে খুন করবেন। বাড়ির মধ্যি ঢোহার সময় মুখডা দেহিছিস? দেহিছি—তুই থো, তাচ্ছিল্য করে ফেকু, পয়সা পালি মুখডা কেমন হয় দেহিস একবার। ফেকু হারামজাদাটারে খুন করতি পারলি হতো—ইনাম ভাবল। তখুনি সুহাস ফেকুর দলে মিশল। সে বলছে, এটু এটু সর হইছে এমন ডাবের মতো লাগে মেয়েডারে। ঠিক কইছি না, ক? তোরেও খুন রতি পারলি হতো—ইনাম আবার ভাবল।

ওরা এখন হাসাহাসি করছে, ঢলাঢলি করছে, কলবল করে আলাপ করছে। দ্-পা এগিয়ে ভেতরে ডাক্তারবাবু বসে আছেন—মোটা শাদা বিরাট শরীর, হারিকেন জ্বলছে, তাই খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল। পুকুরের বাঁধা-ঘাটে একটি মাত্র শুকনো পাতা তখন ফর ফর পাক দিতে থাকল। বাঁদিকের খোলা জায়গাটা এসে গেছে, কুয়াশার সঙ্গে মিশে ঘোলা দুধের মতো চাঁদের আলো খুদে খুদে মরা ঘাসের ওপর পড়েছে। পেছনের জামগাছটা কালো, তার পেছনে সব কালো এবং নির্জনতা। আর এইসব ছাড়িয়ে যেতে আরও নির্জনতা,

পোড়োজমি, জঙ্গল, পানের বরজ, কাশ আর লম্বা ঘাস আর মজা পুকুর আর বিল। এখন ডাইনে দড়ি ঝোলানো বাঁশের গেট। গেট পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জমি চিৎ হয়ে শুয়ে। কিছুই ফলেনি সেখানে। ইনাম পিছনে আছে, অনেকটা পিছনে, এমনকি ফিরে যেতে পারে হঠাৎ এমন মনে হচ্ছে। লাল আলো আসছে কাঠের রড লাগানো জানলা দিয়ে। মজা পুকুরে শিয়ালের চকচকে চোখে ঝিলিক। ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি করে ডেকে ডানা ঝটপট করে পুরনো ডাল ভেঙে বাজ পাখিটা নড়েচড়ে বসল। ফেকু দড়ি ঝোলানো বাঁশগুলো তুলে ধরেছে, হাত নেড়ে ডাকছে সুহাসকে, সুহাস ট্রানজিস্টরটা হাতে নিয়ে অন্য হাতে ঠোঁট চেপে আছে, কিছুতেই এগুচ্ছে না। ইনাম চট্ করে সামনে এসে ফেকুর কাছে টাকা চায়, দুডো ট্যাহা দে—কাল দিয়ে দেবানে। বাঁশগুলো ছেড়ে দেয় ফেকু, অ, খালি হাতে মজা মারতি আইছ? মুহূর্তে সোনালি হাত সামনের আবছায়ায় ভেসে ওঠে। সেই হাত মাথায় রাখে। চুল সমান করে দেয়। আঙুলে তেল লাগলে আঁচলে মোছে। ইনাম নিজে কিনে দিলেও মিলের শাড়িটা খুলে নেওয়া যায় না তখন। ব্যাকুল হয়ে ইনাম বলে, দুটো ট্যাহা দে, কাল দেবানে সত্যি কচ্ছি। ট্যাহা লাফাচ্ছে, মোডে দুডো ট্যাহাই আছে আমার কাছে—ফেকুর মূলোর মতো দাঁতগুলো কড়মড় করে ওঠে। তাহলি সুহাস দে—দে সুহাস কচ্ছি, কাল দিয়ে দেবানে, ঠিক কচ্ছি, দে সুহাস, তোদের মা কালীর দিব্যি, কাল দিয়ে দেবানে—ছটফট করে ইনাম। সুহাস বলে ফেকুকে কিছু কয়নি এতক্ষণ, কেমন গুডিগুডি আসতিছিল দেহিছিস? উরে তুই কি ইস্টুপিট—সে হাসে, মাইরি কচ্ছি, পহেটে হাত দিয়ে দ্যাখ—দুডো ট্যাহা আছে মোডে, দাদার পহেটথে মারিছি, মাত্তর দুটো ট্যাহা। তখন ইনাম ক্ষান্ত হয়। গেটের কাছে ফেকু আর সুহাস গলাগলি দাঁড়িয়ে। জানলার কাঠের রডে মুখ লাগিয়ে বুড়োমানুষ চিৎকার করে, কে, কে ওখানে গো—অ্যাঁ? লাল আলোটা সরে যায় জানলা থেকে, হড়াম করে দরজা খোলে, হাতে হারিকেন নিয়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে গেটের কাছে আসে মানুষটা। সমস্ত উঠোনটায় বিরাট ছায়া, খাটো লুঙির নিচে শুকনো দুটো পা। গেটের পাশে করবী গাছটার কাছে এসে দাঁড়ায়। আলোটা মুখের কাছে তুলে ধরে লোকটা। বোশেখ মাসের তাপে মাটিতে যেন ফাটলের আঁকিবুকি এমনি ওর মুখ। ঠাণ্ডা চোখে ইনামকে দেখে, সুহাসকে দেখে, ফেকুকে দেখে; দেখতেই থাকে, বিঁধতেই থাকে, হারিকেনের বাতিটা তোলে কাঁপা হাতে, এসো। তোমরা? ভাবলাম কে আসছে এত রাতে। তা কে আর আসছে এখানে মরতে? জেগেই তো ছিলাম। ঘুম হয় না মোটেই—ইচ্ছে করলেই কি আর ঘুমানো যায়—তার একটা বয়েস আছে—অজস্র কথা বলতে থাকে সে, মানে হয় না, বাজে কথা বকবক করেই যায়। এসো, বড্ড ঠাণ্ডা হে, ভেতরে এসো।

কিন্তু ভেতরে কি ঠাণ্ডা নেই। একই রকম, একই রকম। দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে। সবাই ভিতরে আসতে করবী গাছটার একটা ডাল ঝটকানি দেয়—পায়ের নিচে মাটি ঠাণ্ডা শক্ত আর সেজন্য ইনামের গোড়ালিতে ব্যথা করছে।

ভিতরে কালো রঙের চৌকিটা পড়ে আছে। ঘুমের মধ্যে মুরগিগুলো কঁ কঁ করে উঠল। আবারো হু-উ-উ চিৎকার এলো। বিলে বাতাস উঠছে শোনা গেল। ভাঙা চেয়ারে ভদ্রলোকটি বসে। হারিকেন মাটিতে নামানো। ওরা তিনজন চৌকিতে কাছাকাছি বসেছে। কেউ কথা বলছে না। বুড়োর এ্যাজমার কষ্টের নিশ্বাস পড়ছে। তুখোড় লোকটা এখন চুপ—ভস ভস বাতাস ছাড়ছে মুখ দিয়ে। খোঁচা খোঁচা শাদা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। শিরাওঠা আঙুলগুলো চেয়ারের হাতলে পড়ে আছে। নোংরা নখ দীর্ঘদিন কাটা নেই। গলার কাছে শ্লেষ্মা এসে জমলে বাতাস যাওয়া আসা প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। ইনামের ইচ্ছে হলো একটা নল দিয়ে সাফ করে দেয় ফুটোটা। তারপর কি খবর? অ্যাঁ? সব ভালো তো? ঘড় ঘড় করে একটানা কথা আরম্ভ হয়। আক্ষেপ বিলাপ, মরে গেলেই তো হয় এখন, কি বলো তোমরা? টক করে মরে গেলাম ধরো। তারপরে? আমার আর কি—ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং, চলে গেলাম, বুঝে মরগে তুই বুড়ি—ছানাপোনা নিয়ে বুঝে মরগে।...এই তোমরা একটু-আধটু আসো, যখন তখন এসে খোঁজ খবর নাও। সময় অসময় নেই বাবা তোমাদের। তোমরাই ভরসা, আমার পরিবার তোমাদের কথা বলতে অজ্ঞান। ফেকু ভয় পেয়ে গেছে এখন। বুড়োর মুখের দিকে বারবার চেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে আর সিঁটিয়ে যাচ্ছে। সুহাস চোখ দুটো গোল গোল করে চেয়ে আছে। বুড়োর মুখ এখন বহুরূপী। সুহাস ভাবছে, কেশো বুড়োটা খুন করবেন মনে হতিছে আমার। আজ ক্যানো যে আলাম। না আসলিই ভালো হতো।...তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হতো এই জংগুলে জায়গায়—বুড়ো বলছে, বাগান থেকে অন্ন জোটানো আবার আমাদের কম্ম—হ্যাঁঃ। ওসব তোমরা জানো। আমরা শুকনো দেশের লোক, বুইলে না? সব সেখানে অন্যরকম, ভাবধারাই আলাদা আমাদের। এখানে না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা না থাকলে বাবারা! ছেলেমেয়েগুলো তোমাদের কি ভালোই না বাসে! এই দ্যাখো না, বড়ো মেয়েটা, রুকু এখন চা রতে যাচ্ছে তোমাদের জন্যে—একটা শ্লেষ্মা শ্বাসনালীটাকে একবারে স্তব্ধ করে দেয়, তাতে চোখ কপালে তুলে বুড়ো কাশছে। কথার খই ফুটছিল অথচ এখন মরে যাবে নাকি? আমরা চা খাবো না, আমরা চা খাবো না—চিৎকার করে ওঠে সুহাস আর ফেকু। খাবে না? বুড়ো সামলে নিয়ে শান্তভাবে বলে, অ, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা এখন চা খাবে না—অ্যাঁ—আচ্ছা, ঠিক আছে।

বিল থেকে বাতাসটা উঠে আসছে। এখন অশথ গাছটার মাথায় ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, এগিয়ে আসছে, খঞ্জনির বাজনাও এগিয়ে এলো সঙ্গে খোলের চাঁটি আর কি বিশাখার কথা, কি তমালের কথা—সব এসে আবার দূরে চলে গেল। সুহাসের চাদরের মধ্যে নোট খড়মড় করে। সেগুলো নিয়ে ফেকু নিজের পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে দলা পাকায়, ভাবে, ভয় পায়, শেষে বুড়োর দিকে ঝুঁকে পড়ে, সুহাস আর আমি দিচ্ছি।

চেয়ারের ওপর লোকটা ভয়ানক চমকে ওঠে। পড়ে যাবার মতো হয়। খটাখট নড়ে পায়াগুলো, তোমরা দিচ্ছ, তুমি আর সুহাস? দাও। আর কত যে ধার নিতে হবে তোমাদের কাছে! কবেই বা শুধতে পারব এইসব টাকা? সুহাস উঠে দাঁড়ায়। চলে যাবে এখন? এত তাড়াতাড়ি? রুকু রাগ করবে—চা করতে দিলে না ওকে। ওর সঙ্গে দেখা না করে গেলে আর কোনোদিন কথা বলবে না। দাঁড়াও—হারিকেনটা রেখে বুড়ো বেরিয়ে যায়। ছায়াটা ছোটো হতে হতে এখন নেই। মুরগিগুলো আবার কঁ কঁ করে ওঠে, কথা বলে ওঠে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তীক্ষ্ণ গালাগালি অন্ধকারকে ফাড়ে, চুপ, চুপ, মাগী চুপ কর, কুত্তী—এবং সমস্ত চুপ করে যায়। বুড়ো ফিরছে এখন—মাথা নামিয়ে কাঁধ ঝুলিয়ে ঘরে ফিরে এসে ফিস ফিস করে, যাও তোমরা, কথা বলে এসো, উই পাশের ঘরে। ইনাম তুমি বসো, এখ্খুনি যাবে কেন? এসো গল্প করি।

বুড়ো গল্প করছে, ভীষণ শীত করছে ওর, চাদরটা আগাগোড়া জড়িয়েও লাভ নেই। শীত তবু মানে, শ্লেষ্মা কিছুতেই কথা বলতে দেবে না তাকে। আমি যখন এখানে এলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে সে বলছে, বুঝলে যখন এখানে এলাম...তার এখানে আসার কথা আর কিছুতেই ফুরোচ্ছে না—সারা-রাত ধরে সে বলছে, এখানে যখন এলাম—আমি প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই...তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনারঙের দেহ—সুহাস হাসছে হি হি হি—আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে? বলে থামলো বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল, ফুলের জন্যে নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে। আবার হু হু ফোঁপানি এলো আর এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ—প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই বুঝেছ আর ইনাম তেতো তেতো—এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি?

১৯৬৬

খোয়াই নদীর বাঁকবদল

সেলিনা হোসেন

শীতকালে খোয়াই নদীর বুকে বাপের মতো হাঁপানি জমজমাট হয়। যৌবনের ভুসভুসানি নেই। কেবল হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়া। মনুমিয়ার বুকটা কট্‌কট করে। শীতকালে নদীটার যে কী হয়! একটুও ভালো লাগে না। বর্ষার নদী ছাড়া নদী সইতে পারে না মনুমিয়া। গাঁয়ের সবাই খোয়াইয়ের ওপর বিরক্ত। বলে, খোয়াইটা কেবল দু'কূল ভাঙে। বর্ষায় আমাদের পরানটা গলায় এনে ঠেকায়। অথচ মনুমিয়া নদীর উদ্দামতা যখন দু'কূল ভাসিয়ে নেয় তখন বিস্মৃত হয়ে নদীর মতো শক্তি প্রার্থনা করে কেবল। অন্য কোনো কিছুই নদীর চাইতে বড়ো মনে হয় না। নদীর কানটায় কানটায় হাঁটতে হাঁটতে মনুমিয়ার বুকের কট্‌কটানি চড়চড়িয়ে ওঠে। তখুনি সে-বোধ ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজের জমির চিন্তায় ফিরে আসে। চিন্তাটা একটা চমৎকার গুহা। এটাই মনুমিয়ার ধ্যানের পবিত্র স্থান।

খোয়াই নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সে বাঁকটা একটা দ্বীপের মতো। ওই দ্বীপটা মনুমিয়ার স্বপ্ন। পুরোটা দখল করতে পারলে একটা ভূখণ্ডের রাজা হয়ে যাবে সে। তাই অনবরত জমির সীমানা বাড়াবার স্বপ্ন দেখে। খোয়াইয়ের মতো উদ্দাম হয়ে অন্যের আল ভেঙে সব জমি দখল করে নিতে ইচ্ছে করে। চিন্তাটা মনের ভেতর উলশ কাটে। মাছের মতো লেজের সঞ্চালন টের পায় সে। এখন মনুমিয়ার অস্বস্তি বাড়ে। নিরিবিলি পথটা সাপ হয়ে যায়। অন্ধকার মেঠো পথ ছোবল মারে। মনুমিয়া চুল টেনে ধরে। হাতের চামড়া কামড়ে রাখে। তবুও দপ্‌দপানি থামাতে পারে না। তলপেট ভার হয়ে আসে। আলের ধারে পেসাব করতে বসে। এই এক বাতিক। বেশি উত্তেজিত হলে পেসাব ধরে। তখন অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়। কানশিলা আগাছাগুলোর মাথা নুয়ে যায়। এবং এই অবস্থাতেই হিসেব কষে। দাদা তেমন কিছু রেখে যেতে পারেনি। উপরন্তু দেনার ভারে বাবাকে কাহিল করে দিয়েছিল। এ জন্যে দাদাকে দু'চোখে দেখতে পারত না মনুমিয়া। তার যৌবনে বুড়ো দীর্ঘদিন অসুখে ভুগে খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে।

উদ্যোগী পুরুষ না হলে সে মনুমিয়ার দু'চোখের বিষ। তাকে সে কেঁচোর চেয়েও নগণ্য ভাবে। বাবা অনেক কষ্টে বিঘা দশেক করেছেন। মনুমিয়া বাপ্‌কা

বেটা। সেটা বাড়িয়ে বিঘা পঞ্চাশেক করেছে। আরো চাই। আরো। একটা বিশাল ডেমরা ডোল। মনুমিয়া তার একচ্ছত্র সম্রাট। সে সাম্রাজ্যের সূর্য ডোবে না। দিশপাশহীন নিজের জমির দিকে তাকিয়ে থাকলে তার ভেতরটা টুন্‌নুর টুন্‌নুর করে।

ছেলেবেলায় কিছুতেই অঙ্ক বুঝতে পারত না মনুমিয়া। স্কুলের মাস্টার সাহেবের হাতের বেত লিকলিকিয়ে ওঠার আগে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠত। কিন্তু তাতেও রেহাই ছিল না। গোত্‌মা-গাত্‌মা মাস্টারসাহেব নাদুস শরীরটা দুলিয়ে দাঁতমুখ খিঁচাতেন। দাঁতাল শুয়োরের মতো চিল্লিয়ে বলতেন, ভেবে দেখ হারামজাদা অঙ্কটা কি চায়? না, অঙ্কটা কি চায় এটা কোনোদিনই ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারেনি মনুমিয়া। ভাবতে গেলে চোখের সামনে ঘিরগিশটি অন্ধকার ঘনিয়ে উঠত। নিবিড় ঘন সে-বর্ণ ভেদ করে কিছু দেখতে পেত না। এখন মনুমিয়া কড়াগণ্ডায় জমির হিসেব বোঝে। একটুও ভুল হয় না। কত হাজারে কত কাঠা, কোন্ জমিতে ফলন বেশি হবে, কোন্ মাটি সরেস—একটুও ঠকাবে না তা জানার জন্যে গাঁয়ের লোক ওর কাছে আসে। মনুমিয়া চোখ বুজে নির্দ্বিধায় সব কথা বলে যায়। ফোকড়া-ফোকড়া মাঠের আল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনুমিয়ার মগজের চৌচালাকি তিড়িং-বিড়িং করে। ও আপন মনে হাসে। মগজের শিরায় এত প্যাঁচ কেমন করে খেলে ভেবে নিজেও অবাক হয়। নিজের ওপর শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মনুমিয়া গদোগদো হয়ে যায়। মাঝ-মাঠের খাঁ-খাঁ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকায়। মনুমিয়া কুড়ে-কুড়ে হাঁটে। সকলে ভাবে ওর সঙ্গে বুঝি কেউ নেই।

কিন্তু মনুমিয়া জানে ও একা নয়। ওর অন্তর ঠাসা লোকজনে। চারপাশে গিজগিজ করে অজস্র বুনোপাখি, গাছ-গাছালি, বিচিত্র ঘাসের দাম। সেসব আর কিছু নয়, মনুমিয়ার বিঘা-পঞ্চাশেক জমি। সে জমি মনুমিয়ার সমস্ত জীবন। এর বাইরে সে আর কারো পরোয়া করে না। বউ না, ছেলে না, মেয়ে না। তাই মনুমিয়ার জীবন কখনো চষা খেত, কখনো ছিপছিপানি নালার কাদামাটি, কখনো আঁকাবাঁকা আল, কখনো ফসলের পূর্ণিমা।

মনুমিয়া একটা সত্য বোঝে—তাহলো উৎপাদনক্ষম জমি মানেই জীবন। সে কারণেই বাঁজা বড়ো মেয়েটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না ও। মাস-ছয়েক আগে জামাই আর একটা বিয়ে করেছে বলে মেয়েটা বাপের কাছে চলে এসেছে। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে কোনো সন্তান হয়নি বলেই ওদের যত রাগ। মনুমিয়া প্রথম প্রথম লাফালাফি করেছিল। চিৎকার করে গাল দিয়েছিল জামাইকে। বলেছিল, আগে বিচার করে দেখা যাউক কে বাঁজা। জামাইও শাসিয়েছিল শ্বশুরকে।

নফিজাই ব্যাপারটাকে গড়াতে দেয়নি। ওর মনে হয়েছিল যে জীবনটাকে চুকিয়ে-বুকিয়ে দেয়া হলো তাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? নিজে যদি বাঁজা নাও হয় তবু ওই বাড়িতে আর ফিরে যেতে পারবে না। গুমোট সম্পর্ক ওর সহ্য হয় না। ও চায় খোলামেলা যগ্‌যগা জীবন। নফিজা জানে হাবিব একটা গাংগিলা—মরা নদী। যৌবনের তথতথি নেই। সেই শীতল সোহাগ ওকে মৃত্যুর স্পর্শ দিত। বুকটা কেমন চেপে আসত নফিজার।

অনেক আগেই চলে আসা উচিত ছিল ওর। দশটা বছর অযথা নষ্ট করেছে। সে বছরগুলো ফিরে পাবার জন্যে নফিজার বুকের ভেতর এখন হাজার যন্ত্রণার গপগপি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মনুমিয়ার আশংকা ধোপে টেকেনি। খবর পেয়েছে হাবিবের নতুন বৌ পোয়াতি হয়েছে। এই খবরের পর মনুমিয়া বড়ো মেয়ের ওপর আরো বিরক্ত। জামাইয়ের কাছে মুখটা ছোটো হয়ে গেছে।

মনুমিয়ার তিন ছেলে। কারো মধ্যে জমির জন্যে কোনো দক্‌দকে ভালোবাসা নেই। জমি ফসল দেবে ওরা খেয়ে-পরে বাঁচবে। এটা ওদের দাবি। কিন্তু তেমন নাড়ির টান নেই। যে-টানটা মনুমিয়ার নাড়ির পরতে-পরতে। ছেলেগুলোকে সারাদিন গালাগাল করে ও। তারপর একসময় রাগ করে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। হাঁটতে হাঁটতে জমির নগ্‌নগে নরম মাটি ওকে যাদু করে। তখন সংসারের আর দশটা খ্যাচাখেচির কথা অবলীলায় ভুলে যায় মনুমিয়া। অনেক দূরে খোয়াই নদীর বুকটা ধওলা দেখায়। নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সে পর্যন্ত আপাতত জমির সীমানা। মনুমিয়া ভাবে নদীটা প্রান্তর হলে ও সেটাও দখল করে নিত। মনুমিয়ার চিন্তার কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। নাড়ামুড়া গাছের মতো সোজা গতিতে তড়বড়িয়ে বাড়ে। আর এই সরল রৈখিক চিন্তার মাথায় পত্‌পত্‌ ওড়ে জমির স্বপ্ন।

ক'দিন ধরে আকাশের অবস্থা ভালো না। দুপদুইপ্‌পাঁ বৃষ্টি পড়ছে। থামার নাম নেই। এমন বৃষ্টিতেও বেরিয়ে পড়ে মনুমিয়া। দু'দিন বেরোয়নি বলে কিছুতেই আর ঘরে থাকতে পারল না। এমন তুমুল বৃষ্টিতে কাছের কোনো কিছুই ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। জোর করে দৃষ্টি মেলে রাখলে ধুকাধুকা একটা রেখা বনবনিয়ে ওঠে, তারপর মিলিয়ে যায়। কখনো সেটা ছাই রঙ হয়। কখনো নীলাভ। পায়ের নিচে দিয়ে দামুল স্রোত বয়ে যায়। ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে না চষা খেতের আলের ওপর। মাথালটা কোনো কাজেই আসে না। বৃষ্টির জোর ক্রমাগত বাড়ে। সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্‌সপ্‌ করে। তবুও হিটেহোটে ঘোরে মনুমিয়া। কালো কুচকুচে জোঁকটা কখন পায়ের মাংস কামড়ে ধরেছে টের পায় না। জমিতে এলেই মনুমিয়ার শরীরের অভ্যন্তরীণ চলাচল উল্টেপাল্টে যায়। তখন বাইরের কোনো খবর ওকে তেমন আলোড়িত করে না। মনুমিয়া

আলের ওপর ধিমেধিমে হাঁটে। টের পায় দূরে খোয়াই নদীর উদোম বুকে বৃষ্টির ফোঁটায় বুষবুড়ি ওঠে। বাবার কথা মনে হয় ওর।

মাসখানেক ধরে বাবার হাঁপানিটা খুব বেড়ে গেছে। কাশির দমকে রাতে ঘুমোতে পারে না। মনুমিয়াকে প্রতিদিন বলে শহরে নিয়ে যেতে। গাঁয়ের ডাক্তার এখন ডাকলেও আর আসে না। বলে দিয়েছে এখানে বসে কিছু হবে না। শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেলে ভালো হলেও হতে পারে। আর তখুনি একটা না-না ধ্বনি বৃষ্টির ফোঁটার মতো বুষবুড়ি ওঠায় মনুমিয়ার মনে। শহরে চিকিৎসা মানে অনেক টাকা। আর সে টাকা জোগাড় করতে হলে মনুমিয়াকে জমির ওপর হাত দিতে হবে। বাবার কণ্ঠস্বরটা কেমন ইনিয়েবিনিয়ে ভেসে আসে, ও মনু আমারে এট্টু শহরে লইয়া যা। আর পারতাসি না। আমার বড়ো কষ্ট অয়রে।

বাবার চোখজোড়া যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। মনুমিয়া সে দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যায়। বাবার হাঁফধরা বুকটা দপ্পরদপ্পর করে। মনুমিয়া ভাবে বাবা নিজে বিঘা-দশেক জমি করেছিলেন। কিন্তু ওই ভাবনাটুকুই শেষ। কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা আর করা হয় না। কৈকরী লতা পায়ে জড়িয়ে যায়। সেটাকে এক্‌টানে উপড়ে ফেলে মনুমিয়া আবার হাটে। বৃষ্টির তোড় কমেছে। তবে ছাড়ার লক্ষণ নেই। নানাবিন্‌নি ভাবনায় আক্রান্ত হয়ে মনুমিয়া খোয়াই নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। নফিজা একদিন দাদার বুকে তেল মালিশ করে দিয়ে রুষ্ট চেহারায় বাবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

জমিখান তুমার হক্কল থাকি বড়ো হইলো? বুড়ো বাফের কষ্টটা কুত্তা না?

তুই মাতিছ না।

মনুমিয়া তীব্রকণ্ঠে ধমকে উঠেছিল।

জমিনে তুমারে খাইবে।

নফিজা দুপ্‌দাপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বড়ো ছেলেটা ম্যাট্রিক পাশ করেছে। শহরে গিয়ে পড়তে চায়। বেশি লেখাপড়া মনুমিয়ার ভালো লাগে না। অত পড়ে কি হবে। যেটুকু পড়িয়েছে ততোটুকুই বেশি। তবুও ছেলেটা জেদ করছে। কিন্তু বাপের সঙ্গে পেরে উঠছে না। আমি তুমার লাকান আলুচা চাষা থাকতাম পারতামনায়। আমি লেখাপড়া হিকিয়া মানুষ অইতাম।

থামথুম পরিবেশ কাঁপিয়ে হো-হো করে হাসে মনুমিয়া। কণ্ঠস্বরটা প্রতিধ্বনিত হয়ে নিজের কাছে ফিরে আসে। কোথাও মানুষ নেই। চারদিক ভাট্‌ভাট্‌ করেছে। মনুমিয়া আপন মনে গজগজায়, আমি মানুষ কিতা নায়লি।

নদীর বুকের ওপর দিয়ে পানকৌড়ি উড়ে যায়। অনেক দূর থেকে একটা

শব্দ আসে। গুমগুম ধ্বনি। পাহাড়ের গাঁ ঘেঁসে রেল যাচ্ছে। কেমন যেন ফাক্‌কা লাগে। আমি কিতা মানুষ নায়লি?

কথাগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে মনুমিয়া। বৃষ্টির এখন পিনপিনি অবস্থা। হঠাৎ করে কিছুই ভালো লাগে না ওর। ফেচুত ফেচুত পাখি ডাকে একটা। শব্দটা আরো বিরক্তিকর।

ওই পাখিটা এখন শব্দ না করলেই পারত। ওই গুমগুম ধ্বনিটা না হলেই পারত। সবকিছু কেমন মনুমিয়ার ইচ্ছের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। ও যা চায় না সবাই মিলে ঘাড় ধরে সেটার ভেতরই ঢোকাতে চায়। ছেলেমেয়েগুলোর ওপর বিজাতীয় আক্রোশ অনুভব করে ও। নিজের ঔরসজাত সন্তান বলে মনে হয় না। ওরা ওর কেউ না। ওদের জন্যে একফোঁটা মায়া নেই। ভিজে থিতুবিতু হয়ে থাকলেও মনুমিয়ার পুরো শরীরে আগুন।

হাঁটতে-হাঁটতে হাতেম মুন্সীর আধ বিঘে জমির সামনে এসে মনুমিয়ার দৃষ্টি চক্‌চক্‌ করে ওঠে। তথতথি সবুজ ধানে জমিটা যেন ফুটফুটা রাতের মতো উজালা। মন টেনে ধরে রাখে। ওর জমির গায়েলাগা এ-অংশটুকু অন্যের এটা ভাবতে মনুমিয়ার বুকে কষ্ট বাড়ে। মনুমিয়ার বুকের পাখির টিলিক-টিলিক কিছুতেই থামতে চায় না। পরক্ষণে ঠোঁটের ডগায় ধূর্ত হাসি খেলে যায়। মনকে বুঝায়, মন তুই ঢাপঢুপ থাক। কোনো কথাই না। দেখ আমি কি করি। যেমন করে হাছন, রাজা মিয়া, মনসুরের জমি নিয়েছে তেমন করে হাতেম মুন্সীর জমিও ওর মুঠোয় চলে আসবে। এ পর্যন্ত হাতেম মুন্সী পাঁচশ' টাকা ধার নিয়েছে। আসছে বর্ষায় আরো তিন শ' দিয়ে খাতায় হিসেব দেখাবে এক হাজার। তারপরই হাতেম মুন্সী জমিটা লিখে দিতে বাধ্য হবে। অবশ্য শর্ত থাকবে কোনো দিন টাকা দিতে পারলে জমি ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু সে সুযোগ ওরা কোনো দিনই পায় না। যেমন পায়নি হাছন, রাজা মিয়া বা মনসুর। ফাঁকের অভাব নেই মনুমিয়ার। সে-সব ফাঁকে ওদের গলাটা ফেলে দিতে একটুও অসুবিধা হয় না ওর। ভাবনার সঙ্গে ডুলুম-ডুলুম ভাব ওকে আছন্ন করে রাখে। ফেচুত-ফেচুত। পাখিটা আবার ডাকে। মনুমিয়ার মনে হয়, না ডাকটা ভালো। কি সুন্দর। কানু বৈরাগীর দোতারার মতো। আসলে মন ভালো থাকলে আর সব কিছুতে ডডকলা। মনুমিয়া কারো পরোয়া করে না। তিরতিরা পানির নালা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়। মনুমিয়ার হৃদয়টা তখন বালক হয়ে যায়। চপলমতি বালক। লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে ইচ্ছে করে। আর তখনই পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে আসা গুমগুম ধ্বনিটা কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। সে শব্দটা এখন কানু বৈরাগীর বাউল গানের গভীর কণ্ঠস্বর। মনুমিয়ার বুকের তলদেশ পর্যন্ত শীতল করে দেয়। ডুলুম-ডুলুম ভাবটা আরো গাঢ় হয়। মনুমিয়া ঘরমুখো হয়। ঘুরপথ ছেড়ে কোনাকুনি

রাস্তায় নেমে আসে। মাথার ওপর দিয়ে একসার বালিহাঁস উড়ে যায়। কক্‌কক্‌। মনুমিয়া জিভ দিয়ে শব্দ করে। বালিহাঁসের মাংস ওর প্রিয়। পাখিগুলো দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত মনুমিয়া হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কেমন আড়মবুল ভাব। হঠাৎ করে মনুমিয়ার সমস্ত চলাচল যেন থমকে গেছে। সময়টা দুপুর। পেটে ভীষণ খিদে। অনেকক্ষণ মনুমিয়া নড়তে পারে না। সামনের ইজিবিজি পথটা শয়তানের মতো ডাকছে। পরক্ষণে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মনুমিয়া সবেগে চলতে থাকে। বৃষ্টি ধরে গেছে। এখানে-ওখানে থৈ-থৈ পানি। উঁচু থেকে স্রোত নামছে। মনুমিয়ার পায়ের পাতা সাদা হয়ে যায়।

বারান্দায় উঠতেই নফিজার মুখোমুখি হয়। বুকটা ধড়াস করে ওঠে। মেয়েটার চোখে তীব্র অথচ বিষণ্ন চাউনি। থম ধরে আছে।

যে-কোনো সময় মেঘের মতো কড়াত করে গর্জে উঠবে। একঝলক বিদ্যুৎ দেখার আগেই মনুমিয়া দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়।

দাদার হালত খুব খারাপ।

কিতা আইছে?

দেককিয়া আওগিয়া।

নফিজা আবার ঘরে ঢোকে। মনুমিয়া ভিজে কাপড়-চোপড় নিয়ে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরে ঢোকার সাহস নেই। স্পষ্ট গোঙানির শব্দ আসছে। ঠোঁটের মাথায় গাজলা-গাজলা ফেনা। গোঙানির শব্দটা পাক খেয়ে ঘুরতে-ঘুরতে মনুমিয়ার গায়ের ওপর পড়ে। যেন হাছনের কণ্ঠস্বর : সাব আমার জমিখান ছাড়িয়া দিলাওকা সাব? হাছন পা ধরতে আসে। মনুমিয়া পা টেনে নেয়। চিৎকার করে রাস্তা দেখিয়ে বলে, যা ইকান থাকি।

ইতা কররায় কেনে? লও।

নফিজা একটা শুকনো লুঙ্গি এগিয়ে দেয়।

জলদী দাদার কান্দাত গিয়া বও। অনকুওউ দম বারওই যাইবগি।

গোঙানির শব্দটা এখন অন্যরকম। থেমে থেমে আসছে। শুকনো লুঙ্গিটা পরতে গিয়ে হাঁটু কাঁপে মনুমিয়ার। গোঙানিটা এখন মনসুরের কণ্ঠস্বর। তীব্র অথচ থমধরা।

হক্কির মাল সাব, ইলান জোর করিয়া দকল করকুয়ানা।

যা বেটা, যা কইলাম।

মনুমিয়া খিস্তি করে। ভিজে লুঙ্গিটা ধপ্‌ করে মাটিতে পড়ে যায়। সারা শরীরে নফিজার চোখের বিদ্যুৎ। মেয়েটা ভিজে লুঙ্গি নিংড়ে মেলে দেয়। মনুমিয়া তাড়াতাড়ি বাবার চৌকির পাশে এসে বসে। নিজেকে ধরে রাখতে পারে না।

বাবা—বাবা গো—

বৃদ্ধ নিমীলিত চোখে মনুমিয়ার হাতটা আঁকড়ে ধরে। ঠোঁট নড়ে। কথা বেরোয় না। হঠাৎ খুশিতে গোঙানিটা বন্ধ হয়ে গেছে? যেন বুকে আর কোনো হাঁপানি নেই। ঠোঁট বেয়ে কষ গড়িয়ে পড়ে।

মনুমিয়ার হাতটা থর থর করে কাঁপে।

বাবাগো—ও বাবা—

ডুকরে ওঠে মনুমিয়া।

কান্দো কেনে, শরম করেনানি?

নফিজার তীব্রকণ্ঠে মনুমিয়ার মাথাটা বাবার শরীরের কাছাকাছি চলে আসে।

ঢং ডাং না করিয়া দুয়াদরুদ পড়।

বাইরে আবার মেঘ ডাকে। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। নফিজার চোখের দিকে তাকাতে ভয় হয় মনুমিয়ার। এই প্রথম কারো চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল। বুকটা গুরুগুরু করে।

মনকে শাসায়। মনরে কিছু না। ঐ পুঁচকে ছুঁড়ি কি জানে। এক পয়সার মুরোদ নেই বাপের ওপর কথা বলতে আসে। তবুও মনুমিয়ার হিনজালি বুকটা বরফের চাকের মতো শক্ত হয়ে যায়।

দাদার মৃত্যুর পর নফিজা যেন পাল্টে গেল। ওর আনকৃঠানক ভালো লাগে না মনুমিয়ার। সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে। হয় পুকুরঘাট, নয় ঢেঁকিঘরে। মা ডাকলেও সাড়া দেয় না। আগে মনুমিয়ার সঙ্গে দু'চারটা কথা বলত। কাছে আসত। লুঙ্গি-গামছা দিত। ভাত খাবার সময় পাখা নিয়ে বসত। পান এগিয়ে দিত। পাকা চুল বাছত। নফিজা এখন সামনে আসে না। মনুমিয়ার রাগ হয়। গাল দেয়। বাঁজা মেয়েটার দূরে থাকাই ভালো। তবুও কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। ইতিবিতি খোঁজে মেয়েকে। হঠাৎ করে কখনো শুধু নফিজার জন্যে মনের ভিতর মায়ার স্রোত বয়। ঘরটা ভেঙে গেল মেয়েটার। ছেলেপিলেও নেই। কেমন করে জীবন কাটাবে? পরমুহূর্তে ধুত্ বলে সব উড়িয়ে দেয়। যার কপালে সুখ নেই, তাকে কি জোর করে সুখ দেয়া যায়! সবার জীবনটাই হিজলদাগায় ভরা। পানি সরে না কিছুতেই। শ্যাওলা পড়েই থাকে। চাইলেই কি আর ফসল গবগবায়। তার জন্যে আলাদা কপাল চাই। মেয়েকে কেন্দ্র করে মনুমিয়ার আড়িগুড়ি চিন্তা আবার সোজা হয়ে যায়। কোনোরকম দুর্বলতার প্রশ্রয় দেয় না। মনকে বলে, মনরে তোর উটুশ-পুটুশ থামা। নইলে বড়ো ভয়। চঞ্চল হলেই ওরা হামলে পড়বে। খালি আদায় করে নিতে চাইবে। মনকে হাজার শক্ত করলেও ছেলেমেয়ের বায়না আছেই। সেটা কিছুতেই এড়াতে

পারে না মনুমিয়া। যত দাপটই বাবা দেখাক তাতে ওদের শীত-গ্রীষ্ম নেই। বড়ো ছেলেটা একদিন সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আমি শরে লিয়া কলেজে পড়মু।

খরচ—

তুমার অত ধান দিয়া কিতা করবার?

কেনে, ধান বেচিয়া আমি জমি রাখতাম—

অতো জমিন দিয়া কিতা করতায়?

তর কাছে কইপত দিতামনি? হরিজা আমার হমুক থাকি—মনুমিয়া রেগে যায়। রাগলে তোতলাতে থাকে।

এই জমিনের মায়ায় দাদার ডাক্তারি করাইলায় না। দাদা মরি গেলগি। আমারে পড়াইতায়নায়। আমি শরে গিয়া কলেজ পড়মুও।

খরছ—

আমার বৃত্তির টাকা আছে। আর যা লাগব বড়ো মানুয়ে দিতা কইজন।

কিতা? কিতা কইলি বেটা?

হাছা কতা কইছি। হকলে তুমার লাকান নায়।

জমির শেখের অত বড়ো সাহস হইছনি?

সাহস অইত কিতা। আমি গিয়া কইছি এর লাগি তাইন রাজি অইছইন।

ছেলে গটগটিয়ে সামনে থেকে সরে যায়। রাগে বেহুঁশ হয়ে যায় মনুমিয়া। অতিরিক্ত তোতলামিতে গালাগাল ঠিকমতো বের হয় না। নফিজা এসে সামনে দাঁড়ায়। কথা বলে না। আক্রোশ গিয়ে পড়ে ওর ওপর।

কিতা? কিতা কছ? হগল নিমকহারামের বাইচ্ছা। আমার খাইয়া আমার ওপরেও জুরজুলুম করো? হকল হর আমার হুকুম থাকি।

নফিজা নড়ে না। দাঁড়িয়েই থাকে। সেদিকে চেয়ে মনুমিয়া হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। বুকটা লন্ঠনাঠন হয়। নফিজার বদলে জমির শেখের লম্বা ছিপছিপে মেয়েটাকে ওখানে দাঁড়ানো দেখতে পায়। মনুমিয়া স্পষ্ট বুঝতে পারে জমির শেখ ওই মেয়েটার জন্যে ওর ছেলেকে হাত করেছে। কিন্তু তার বিকল্প কোনো পথও খুঁজে পায় না মনুমিয়া। না, ছেলেকে এই চার-পাঁচ বছরের পড়ার খরচ কিছুতেই দিতে পারবে না। বরং ভুল করেছে এতদূর পড়িয়ে। এর আগেই ওদের জমিজমার দিকে নিয়ে আসা উচিত ছিল। তখুনি মনুমিয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। বাকি তিনটি ছেলেকে আজই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনবে। নিজের সঙ্গে করে চাষবাসে নিয়ে যাবে। চাষার ছেলের এত লেখাপড়ার দরকারই-বা কি? কোনো রকম রৌ-রৌ আর ভালো লাগে না মনুমিয়ার। উঠতে যাবে এমন সময় নফিজা ডাকে।

বাবা?

মনুমিয়া চমকে উঠে। ডাকটা যেন কেমন। তবুও ভয়টা চেপে নফিজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

হাকিমরে তুমার আত থাকি ছাড়া ঠিক অইল না।

আত ছাড়া?

মনুমিয়া বোকার মতো চায়। ব্যাপারটা বুঝেও বুঝতে চায় না।

তাইনতো অনকুতাকি বড়োমামুর অইযাইবা—

যাউক্‌দন।

তুমার খারাফ লাগেরনানি?

না, লাগের না।

মনুমিয়া আর একমুহূর্ত ওখানে দাঁড়ায় না। নফিজার দিকেও চায় না। তবু নফিজা মরিয়া হয়ে একটু উঁচু গলায় বলে, তুমি ভুল কররায় বাবা।

ভুল কিতা? বুঝুম এক পুয়া মরিগেছেগিয়া। হাজার ওউক বাপেরতো বাপজান কওয়াওউ লাগব। বাপের নামতান লেখাওউ লাগব।

মনুমিয়া ধূর্তের হাসি হেসে বেরিয়ে যায়। বাইরে এসে বড়ো করে শ্বাস নেয়। না, কোথাও কোনো কষ্ট নেই। ওসব নিয়ে ভাবলেই ঝামেলা। না ভাবলেই বেঁচে থাকাটা ফুরফুরে লটাবন।

খোয়াই নদীর বাঁকের দ্বীপটা এখনো দখল হয়নি। কিছু বাকি আছে। ওইটুকুর জন্যে চড়া দাম চাইছে আক্কাস। তাতেই রাজি হয়েছে মনুমিয়া। যে-জন্যে বাবার চিকিৎসা হলো না, ছেলে বেরিয়ে গেল। এই টাকাটা জোগাড় করতে কম কষ্ট করতে হয়নি ওকে। দমটা এখন গলার কাছে এসে ঠেকেছে প্রায়। তবু ওর মধ্যে আর কারো জমি ওর সহ্য হচ্ছে না। রাজা হওয়ার যে কি সুখ তা ওই হারামি ছেলেমেয়েগুলোকে কি বুঝানো যায়? ওরা এক একটা বেজন্মা। নইলে মনুমিয়ার আপন ছেলে হয়ে কেমন করে জমির কথা ভুলে যায়? মনুমিয়া মাথা ঝাঁকায়। বেশি ভাবনা করলে ঘাড়ের ওপর মাথাটা তখন আলগা ঠেকে। আক্কাসের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। টাকাটা দিতে পারলেই দলিল হয়ে যাবে। ভাবতে গেলে মনুমিয়ার মাটিতে পা পড়ে না। এ গ্রামে আর কেউ এমন একটা পুরো ভূখণ্ডের মালিক হতে পারেনি। অনেকেরই অনেক জমি আছে। কিন্তু সব ছড়ানো-ছিটানো। এখানে-ওখানে। এখন ও অনেকের ঈর্ষার পাত্র। অকারণেই মনুমিয়া লুঙ্গির গেরোটা কষে বাঁধে।

এর মাঝে একটা প্রস্তাবে মনুমিয়া একদম হকচকিয়ে যায়। পাশের গাঁয়ের তোবারক প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ও নফিজাকে বিয়ে করতে রাজি আছে, মনুমিয়া যদি কাঠা দশেক জমি লিখে দেয়।

পান চিবুতে-চিবুতে ঘটক যখন কথাগুলো বলে, মনুমিয়া হঠাৎ করে কিছু বলতে পারে না। টের পায় বেড়ার পাশে খসখসানি। নফিজা আড়ি পেতে আছে। ইদানীং মেয়েটা যে একদম বদলে গেছে সেটা বোঝে মনুমিয়া। সারাদিন কেমন মনমরা হয়ে থাকে। যেন আথাই পানিতে ডুবে যাচ্ছে।

ঘটক তখনো বকবকিয়ে যায়, রাজি অই যাউকা সাব। অমন সুযুগ আর আইতনায়! আফনার পুড়ির দিকঅতো দেইখতে অইব। আস্তা জীবনটা কিলান কাইটব। একানে বিয়া অইলে সুখ অইব।

সুক?

একটা শব্দে মনুমিয়ার হুঁকোর টান বন্ধ হয়ে যায়!

যার কপালে সুখ নাই, তানরে সুক কিন্যা দেওয়া যায় না।

বেড়ার পাশ থেকে খসখসানির শব্দ দ্রুত সরে যায়। মনুমিয়া জোরে জোরে হুঁকো টানে। ইচ্ছে করে ঘটকের মাথাটা ফাটিয়ে দিতে। বাড়ির ভেতর থেকে ঘটকের জন্যে আর এক দফা পান আসে। মনুমিয়া আরো রেগে যায়। বেটা বসে বসে পান চিবোয়। কথা বলে না। এদিক-ওদিক চায়। মনুমিয়া হুঁকো রেখে উঠে পড়ে।

আমার কাম আছে। জমিনে যাইতাম অইব।

আমি অনকু—

আফনি অনকু যাউকা গিয়া।

আমার কতাকান রাখলানা?

অয়, রাখতাম পারলাম না।

পুড়িটার ভবিষ্যৎ—

পুড়ি আফনার না আমার? আমিওই দেখমু।

মনুমিয়া আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে যায়। যে স্বপ্নটা আর দু'দিন বাদে পূরণ হবে অযথা সেখানে আবার ব্যাগড়া। শুভ কাজে এ ধরনের কচকামি সহ্য হয় না। মনুমিয়া খারাপ মেজাজ নিয়ে মাঠে চলে যায়। নফিজার প্রতি ভয়টা আরো বেড়ে ওঠে। সেটা কিছুতেই তাড়াতে পারে না। কিষাণেরা কাজ করছে। চষা খেতের ডেলা ডেলা মাটি এক লাথিতে গুঁড়িয়ে ফেলে। পরক্ষণে মনটা ছোটো হয়ে যায়। নফিজার সুখটা গুঁড়িয়ে গেছে। ওটাকে কি আর জোড়া লাগানো যাবে?

সপ্তাখানেকের মধ্যে আক্কাসের জমিটা মনুমিয়ার পুরো দখলে আসে। বুকের মধ্যে ডিডিম-ডিডিম ভাব। এখন সে দ্বীপের রাজা। কোথাও আর ছড়ানো-ছিটানো নেই। পুরো একটা খণ্ড। সেদিন বাড়ি ফিরে ও প্রথমে নফিজাকেই ডাকাডাকি করে।

নফিজা যেতা চাইছলাম, অতাওউ অইল।

কিতা অইল?

নফিজা অবাক হয়।

জমিন, জমিন। বহুতা একলগে। গাঁয়ের মাঝে অতো জমিন আর কেউর নাই। কিতা গো তুই কুত্তা মাতছ না কেন? তর মারে ক গিয়া আইজ বালা করিয়া রানতে।

অ।

নফিজার বিষণ্ণ চাউনিতে মনুমিয়া দপ্ করে নিভে যায়। এতক্ষণে ভালো করে তাকিয়ে দেখে ওর চোখের নিচে কালি। চুলগুলো কেমন উশ্‌কু-খুশ্‌কু। নফিজা কেমন অপরিচিতের মতো বাবাকে দেখছে। ওর সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মনুমিয়া আবার শক্তি সঞ্চয় করে। হা-হা করে হাসে।

কিতাগো আমারে চিনরেনানি? রাজার নাহান লাগেরনানি? এই নফিজা, নফিজা তুই অনকু রাজার পুড়ি।

বাবা তুমি কিতা পাগল অই গেছনি?

নফিজার ধীর কথায় মনুমিয়ার রাগ হয়। মেয়েটা খুশি হতে জানে না। মেতে উঠতে পারে না। চেঁচিয়ে ওঠে, দূর-হ। নফিজা চলে যায়।

মনুমিয়া একলা ঘরে নিজেকে রাজা ভাবতে ভাবতে আয়েসে চোখ বোজে। কয়দিন আর কাজ করবে না। একটানা ঘুমুবে। আঃ, স্বপ্ন সার্থক হওয়াটা কী যে সুখের! মনকে বোঝায়, মনরে তোর এখন উসুমকুসুম সময়। কেমন রাজা-রাজা লাগে না?

নিজেকে রাজা ভাবতে ভাবতে মনুমিয়ার দিন চমৎকার হাওয়া দিতে দিতে ফুরিয়ে যায়। আবার শীত আসে।

খোয়াই ছোটো হতে থাকে। যৌবন কুঁকড়ে যায়। মনুমিয়া কেবল আয়েস করে। কোনোদিকে ফিরে চায় না। নফিজাই খবরটা প্রথমে দেয়।

বাবা তুমি কুনতা হুনছনি?

কিতা?

খোয়াই গাঙ্গর বাঁক ঘুরাইল অইব।

কিতা কইলি?

আমিতো অতোতা বুজিনা। তুমি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের লগে মাতিয়া দেখ গিয়া? মাইনষে কইন তুমার জমিন মনে কয় আর থাকতনায়। সরকার থাকি নোটিশ আইছে তুমার জমিনের উফরে দিয়া খাল কাটিয়া গাঙ্গর গতি বদলাইল লইব।

মনুমিয়া খেঁকিয়ে উঠে মেয়েকে ঘর থেকে বের করে দেয়। আচ্ছামতো

গালাগালিও করে। কিন্তু মনে স্বস্তি পায় না। বিকেলে চুপিচুপি চেয়ারম্যানের বাড়িতে এসে ওঠে। চেয়ারম্যান ওকে দেখে হাত নেড়ে বলে, কি আর করবা কপালতো হগলতা। অতো কষ্টের জমিন।

চাপা বিদ্রূপের সঙ্গে একটা হাসির ঝিলিক ওঠে চেয়ারম্যানের ঠোঁটে।

আফনারে অবশ্যি ক্ষতিফুরণ দেওয়া অইব।

একটা কথাও বলতে পারে না মনুমিয়া। হাঁ করে চেয়ারম্যানের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অত অজস্র কথা বলে যায় চেয়ারম্যান। সেই সঙ্গে গাঁয়ের লোকের স্বপ্নের কথা। বিরাট কুমীরটা মনুমিয়ার কলজে কামড়ে ধরছে। মনুমিয়া একটুও নড়তে পারছে না।

এসব কথা রক্তে-মজ্জায় কাঁটার মতো গেঁথে নিয়ে মনুমিয়া যখন পথে নামে তখন বিকেল শেষ। সন্ধ্যার ছিনালি প্রকাশ শুরু হয়েছে। ওর বুকের ভেতর হু-হু রব ওঠে। শব্দটা কিছুতেই থামতে চায় না। আকাশে পাতলা জ্যোৎস্না। সেই আলোতে ও হাঁটতে হাঁটতে নিজ সাম্রাজ্যে আসে। আর তখুনি চেয়ারম্যানের কণ্ঠটা খোয়াইয়ের পাহাড়ি স্রোতের মতো কবকবিয়ে ছুটে আসে।

জানেন তো প্রতিবছর খোয়াইয়ের পাহাড়ি ঢলের বন্যায় ভেসে যায় গাঁ-গেরাম। তাই ঠিক হয়েছে খোয়াইয়ের গতিটা বদলে দিলে পানির চাপ কমে যাবে। বর্ষায় নদী তেমন দুরন্ত হবে না। আমরা বেঁচে যাব। গাঁয়ের লোক স্বস্তি পাবে। আর ঐ বাঁক বদলটা আপনার জমির ওপর দিয়েই হতে হবে। আর তো কোনো উপায় নেই। পাতলা জ্যোৎস্নাতে মনুমিয়া পথ খুঁজে পায় না। অথচ এ পথগুলোর নাড়ি-নক্ষত্র সব তার মুখস্ত। কোথায় কোন গর্ত আছে, কোথায় এবড়ো-খেবড়ো, কোথায় ঘাসের দামে পা ডোবে—সব নকশা ওর জানা। মনুমিয়া মেঠোল রাজ্যের হিশেবটা পেরেক ঠুকে মগজের ভেতর মাইলস্টোনের মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এখন মনুমিয়া নিজের জমির নকশা চিনতে পারছে না। সব কেমন ঝাপসা। শ্যাওলা ধরা। পাখি ডাকে একটা। পাহাড়ের গা ছুঁয়ে ট্রেন চলে যায়। সব শব্দ ছাপিয়ে মনুমিয়া আবার চেয়ারম্যানের কণ্ঠ শুনতে পায়।

এটা হলে আমরা সবাই বেঁচে যাব মনুমিয়া। গাঁয়ের লোকের চোখে-মুখে এখন কেবল স্বপ্ন ভাসে। সবাই খুব খুশি। বন্যায় আর আমাদের সর্বনাশ হবে না। খোয়াই আমাদের খোরাক জোগাবে কেবল। আঃ—নদী এমন না হলে সুখ লাগে না। জানেন খোয়াইয়ের গতিপথ বদলানোর কাজ হয়ে গেলে নদীর পরিত্যক্ত তিন মাইল এলাকা লেক হবে। সেখানে আমরা মাছের চাষ করব। লেকের ধারে হাঁস-মুরগির খামার করব। বিরাট এলাকা জুড়ে ফলের বাগান করা হবে। আপনি ভেবে দেখেন মনুমিয়া আমাদের কোনো অভাব থাকবে না।

গ্রামবাসী খুশি হয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে এ-কাজ করবে মনুমিয়া। আগামী মাসেই কাজ শুরু হবে। আপনারও খুশি হওয়া উচিত। তাছাড়া ক্ষতিপূরণ বাবদ আপনি তো অনেক টাকাও পাবেন।

না।

চিৎকার করে ওঠে মনুমিয়া। টেপের ফিতা ছিঁড়ে যাওয়ার মতো ক্যাচ শব্দে চেয়ারম্যানের কণ্ঠ থেমে যায়।

আমার টেকার দরকার নাই।

পাতলা জ্যোৎস্নায় একা দাঁড়িয়ে মনুমিয়া আবার চেঁচিয়ে ওঠে। চেঁচাতে চেঁচাতে গলা দিয়ে রক্ত বেরুতে চায়। তথতথি সবুজ ধানের শিষে এক ফোঁটা বাতাস নেই। আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মনুমিয়ার মনে হয় ও এখন একটা বিরাট সাপের গর্ত খুঁজছে। সে গর্তে কালো কুচকুচে কেউটে থাকে। তার থলি ভরা কালচে সবুজ বিষ। হঠাৎ বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায় মনুমিয়ার। একটা শব্দ আসছে। অসংখ্য কোদালের মাটি কাটার শব্দ। ঝুপ-ঝুপ। মাটি কাটা হচ্ছে। মনুমিয়া বুকের পাঁজরে হাত দেয়। কোপটা যেন ওখানে পড়ছে। না ওখানে নয়। ঠিক কলজের ওপর। না তাও না। মাথার মধ্যে। উঁচু পায়ে, পিঠে। মনুমিয়া পাগলের মতো সারা শরীর হাতড়ে বেড়ায়। কোদালের কোপ কোথায় যে পড়ছে বুঝতে পারছে না। অথচ সর্বত্র টনটনানি। মনুমিয়া গায়ের কাপড় খুলে ফেলে।

মনে হয় শরীরটা একটা লেক হয়ে গেছে। ওখানে মাছের চাষ হচ্ছে। না লেক না, হাঁস-মুরগির খামার হয়েছে। তাও না, বিরাট একটা ফলের বাগান। আঃ, অসহ্য যন্ত্রণা। মনুমিয়ার শরীরটা দুমড়ে-মুচড়ে ওঠে। মনের উসুম-কুসুম সময়টা মনুমিয়াকে আর উত্তাপ দিচ্ছে না।

খোয়াইয়ের পাড়ে এসে থমকে যায় মনুমিয়া। এখন খোয়াই সারা গাঁর প্রেয়সী। খোয়াই সকলের বুকভরা স্বপ্ন। অথচ খোয়াইয়ের পানিতে পা ডুবিয়ে মনুমিয়া চোখের সামনে দিশপাশ অন্ধকার দেখে কেবল।

১৯৮০

সুন্দর মানুষ

বিপ্রদাস বড়ুয়া

মানুষের এক জীবনেও জন্মান্তর হয়। আবার কল্পান্তরেও হতে পারে। সুন্দরও দীর্ঘ দশ বছর ভিক্ষু জীবন যাপন করে একদিন গেরুয়া পোশাক ছেড়ে বেরিয়ে এল। তার দীর্ঘ সাধনাপূর্ণ ভিক্ষু জীবনে এমন কিছু অসঙ্গতি কারো নজরে পড়েনি যে, সে হঠাৎ এমন কাণ্ড করে বসবে।

সবাই জানল যে, সুন্দরের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। মস্তিষ্কের কোথাও গোলযোগ দেখা দিয়েছে। আবার কেউ কেউ ভাবল, অল্প বয়সে কঠোর সাধনার জীবন শুরুই বুঝি এই গুরুতর বিপর্যয়ের কারণ।

ধর্মসাধনায় সে প্রতিটি ব্রত নিয়ম-কানুন নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলত। শুদ্ধ জীবনযাপন করত। অবিরাম ধর্ম-সাধনা, কঠোর নিয়ম, সংযম ও ভিক্ষুদের আচরণীয় পথ অনুসরণ করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিল। তার এই পরিণতিতে সবাই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন বৈকি!

বসন্তের এক সকালে সুন্দরকে বিহারের ঘাসভরা উঠোনে পায়চারি করতে দেখা গেল। সেখান থেকে অস্থির হয়ে এক সময় গেরুয়া পোশাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সবাই তার এই পরিণতি দেখে নানা কথা বলাবলি শুরু করে। গ্রামের বৃদ্ধরা তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে কুশলাদি জানতে চাইল। কিন্তু চুপচাপ সে। কাউকে কিছু বলল না। কারো প্রতি কোনো অনুযোগ নেই, রাগ-দ্বেষহীন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশ কেটে চলে যায় সে। কোথাও এক জায়গায় স্থির বসে থাকে না, লোকজন দেখলে আস্তে আস্তে একদিকে চলে যায়। কখনো কখনো নির্জন নদীতীরে, কখনো-বা মাঠের পাশে, বরোজের পথের উপর বসে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ঋজু শিরদাঁড়া হয়ে পদ্মাসনে বসে দূরের পাহাড় কিংবা নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। খিদে পেলে তিন-চার দিন পর কারো বাড়িতে গিয়ে আসন নিয়ে বসে থাকে। তখন গৃহস্থ বুঝতে পারে তাকে খেতে দেওয়া দরকার।

এভারে তিন-চার দিন পর পর খাওয়া তার অভ্যেসে পরিণত হয়। বিবাহে, নিমন্ত্রণে, মৃত ব্যক্তির সৎকারে সে রবাহূত চলে যায়। চুপচাপ খেয়ে বেরিয়ে আসে। রাতে বিহারের গোলবারান্দায় ঘুমিয়ে কাটায়। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে নদীর ধারে বা মাঠের নির্জনতায় চলে যায়।

গ্রামের লোকজন করুণাবশত ডেকে ভাত খেতে দিত প্রথম প্রথম। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার কাতর হয়ে চুরি করে খাওয়া কিংবা কারণে-অকারণে কাউকে আক্রমণ করার স্বভাবও দেখা যায় না। মানুষের সমাজে সবসময় বাস করেও সে অসহায় একা হয়ে গেল। বিহারের গোলবারান্দা, নদীর ধার, বরোজের পাশ তার কাছে অভয়কেন্দ্র। মানুষের জীবনপ্রবাহ দেখে সে নিজের হতভাগ্য জীবনের কথাও ভাবে। মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়ে ওঠে পূর্বজন্মের কোনো স্মৃতি...কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এভাবে বছর বছর কেটে যায়। সুন্দর একদিন কথা বলতে শুরু করে। ধর্মের নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিজের মতো করে দিতে শুরু করে। তার সেই মতামত এত একান্ত এবং কখনো কখনো এত যুক্তিপূর্ণ যে, কেউ তার যুক্তি খণ্ডানোর ভাষা খুঁজে পেত না। তাছাড়া ধর্মের কিছু কিছু বিষয়ে, যেখানে কোনো যুক্তি চলে না, কিংবা স্পর্শকাতর এমন বিষয়ের অবতারণা সে করে যে কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস পায় না। ভিক্ষু জীবনে সুন্দর বার্মা, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি নানা দেশ ও নানা জায়গায় ঘুরে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিল, এজন্যে সাধারণের পক্ষে তার বিরুদ্ধতা করার যুক্তি ছিল না।

এভাবে কথা বলতে শুরু করার পর গ্রামের লোকজন সুন্দরকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। বয়স্করা তাকে এড়িয়ে চলে, তরুণরা তাকে ঘিরে ধরে। ফলে এক ধরনের অহংবোধ তার মধ্যে জন্ম নিতে শুরু করে। ঠিক অহংবোধ কিনা বলা মুশকিল। তবে সে একরকম হঠকারী হয়ে ওঠে আর লোকজনও তাই তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে।

মাঝে মাঝে সে তরুণদের কাছে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে প্রভাবিত করে তোলে, আবার একদম চুপচাপ ধ্যানমগ্ন হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তখন সবাই তাকে নদীর ধারে, মাঠের পাড়ে ছেড়ে ফিরে যায়।

এরই মধ্যে তার স্বভাবে আর এক পরিবর্তন এল। সে নিজের মনে বিড়-বিড় কথা বলতে শুরু করে সারাক্ষণ। খাওয়া-দাওয়া ভুলে যায়। ছয়-সাত দিনের আগে সে বলতে গেলে কিছুই খায় না।

দিনের পর দিন কেটে যায়। বেরিয়ে পড়ে সে গ্রামান্তরে, মানুষের সঙ্গে কথা বলে। নিজের মতো করে বলে যায় মনুষ্য-জন্ম ও কল্প-কল্পান্তরের কথা। কোনো নিমন্ত্রণে গিয়ে পৌঁছলে সপের মাথায় বসে উদাস হয়ে যায়। কেউ কুশল প্রশ্ন করলে অমলিন হাসিতে উত্তর দেয়। সেই হাসি দেখে অনেকেই

ভাবে সুন্দর এ-পৃথিবীর বাসিন্দা নয়। কবে সে এখানে এসেছে, কবে থেকে বসবাস শুরু করেছে কেউ জানে না—সুন্দর নিজেও জানে না।

মাঝে মাঝে সে সকাল-সন্ধে বিলের পর বিল পাড়ি দিয়ে হাঁটতে থাকে। লোকজন নেই, জনবসতি নেই। শুধু চাষীদের হাল আর বলদ, তরমুজ আর ফুটির খেত, মরিচ অড়হড় কলাই খেত পেরিয়ে চলছে তো চলছেই। আস্তে আস্তে বিল পেরিয়ে, খেত পেরিয়ে, নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে থাকে। মাঝে মাঝে কারু কাছ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে পর পর কয়েকটি টানে সাবাড় করে মুহূর্তের জন্যে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে হুঁকোটা নিয়ে টানতেই বেশি পছন্দ করে আর এক সময় বিলের মাঝে ছায়াদার কোনো গাছের তলায় চিৎপাত শুয়ে চোখ বুজে থাকে। হয়তো ঘুমোয়, হয়তো দিবাস্বপ্নে ভূতগ্রস্ত হয়। কখনো কখনো দোকানের তক্তপোশে বা বেঞ্চিতে ঘুমায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন ভোর থেকে তাকে আর দেখা গেল না। কোথায় উধাও হলো, কি হলো কেউ জানে না। খোঁজ নেওয়ারও প্রয়োজন কেউ অনুভব করল না। তবে সবাই জানে সে আসবে, দু-চারদিন পর ঠিক ফিরে আসবে। এতে কারু কোনো কাজ আটকে থাকবে না।

তৃতীয় দিন সুন্দর ফিরে এল একটি বাচ্চা কুকুর সঙ্গে নিয়ে। বাচ্চাটি সারাক্ষণ তার পিছু লেগেই আছে। কখনো কোলে নিয়ে, বাচ্চা ছেলেদের পিছু নেওয়া হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে সে মাথা উঁচু করে গ্রামের পথে হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়, ঘুরে দাঁড়াতেই ছেলের দলও দাঁড়িয়ে যায়। মুখে কিছু না বলে, গালাগাল না করে নীরবে প্রতিবাদ করে দাঁড়ায়, অথবা কুকুরছানার মতো তাদের প্রতিও মমত্ববোধে অন্ধ হয়ে যায়।

কুকুরছানা সঙ্গী হওয়ার পর থেকে তাকে দুপুরে একবার বিহারে উপস্থিত থাকতে হয়। দুপুর বারোটার মধ্যে ভিক্ষুদের খাওয়া শেষ। তাঁদের এঁটোকাঁটা সংগ্রহ করে বাচ্চাটিকে খাওয়ায় সে। সেই ফাঁকে নিজেরও খাবার জুটে যায়। কিছু না জুটলে পুকুরে নেমে জল খেয়ে নেয়। কারু কাছ থেকে এক গ্লাস জলও ভিক্ষে না চেয়ে হাঁটতে হাঁটতে বরোজের পাশে বড়ো আমগাছের তলায় গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে সারা রাত ঘুমুতে পারে না। যন্ত্রণাদায়ক ঘায়ের মতো অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে, নিজের অসহায়ত্বের যাতনা অনুভব করে। তখন খিদেও বেড়ে যায়, তাড়িয়ে নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে—কতদিন আর জীবন।

সুন্দর নিজের মতো দিনে একবেলা থেকে সপ্তাহে তিন-চার দিন, তারপর সপ্তাহান্তে একবার খাওয়ায় অভ্যস্ত করে তোলে বাচ্চাটিকেও। মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই কুকুরছানাটি এ-ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ আর কাউকে দোষ দেয় না, ছাড়াছাড়ি হওয়ার চিন্তাও করে না।

আরেক বসন্তের মাদার ফুল ফোটা শেষ হলে বাচ্চাটি জোয়ান কুকুর হয়ে ওঠে। সপ্তাহে এক একদিন আর ভালো লাগে না। একা একা লাফ দিতে পছন্দ করে বলে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে চিৎকার জুড়ে দেয়। সুন্দরেরও আর ভালো লাগে না। কুকুরও এক ছুটে বাজারে গিয়ে তার কুকুর সঙ্গীদের সঙ্গে মারামারি হৈ-চৈ করে আসে। তার কুকুর জীবনও তো ফেলনা কিছু নয়। বাজারে গেলে কিছু না কিছু খাবার জোটে। চাই কি কুকুর সমাজ নিয়ে ছোটোখাটো একটা দলও গড়ে তুলতে পারে। কাজেই সে-ও অবুঝ হয়ে ওঠে। তবুও রাতে সুন্দরের পাশাপাশি শোয়, শীতের রাতে একই বিছানায় কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে থাকে। বর্ষার দাপট কমে আসতে না আসতেই দেহটা চনমন করে ওঠে। কিন্তু এ পর্যন্ত সুন্দরও যেমন নারী সংসর্গ বর্জিত, কুকুরও তাই। হয়তো ছয় দিন ধরে ভাতের মুখ দেখতে না পেয়ে এক ধরনের গোয়ার্তুমিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে সুন্দর ও কুকুর। বসন্তের ফুরফুরে হাওয়ায় ওরা আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এ সময় সুন্দরকে লোকে কাজে ডাকে। তরমুজ-ফুটি পাকার সময় তো, রাতে পাহারা দরকার। শেয়াল ও খাটাস নেমে তছনছ করে দেয় খেত।

খাওয়া-দাওয়ার বিনিময়ে সুন্দর পাহারাদার হয়। রাতে শেয়ালগুলো প্রথমে দূর থেকে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু করে। তারপর নিঃশব্দে তরমুজ খেতে নেমে আসে। মাঝে মাঝে দূরে নদীর বাঁক থেকে যেন ডাক দেয়—সুন্দর চলে এসো। তখন সে হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়ে। ভয় জাগে মনে। কুকুরটাকে তাড়াতাড়ি কাছে টেনে নেয়। সারা মাঠ তখন নিবিড় এক শূন্যতায়, একরকম প্রশান্তিতে ঝমঝম ঝমঝম বাজতে থাকে। ঠিক বাজনার শব্দ নয়, সুন্দরের মধ্যে সবকিছু কেন জানি এলোমেলো হয়ে যায়। তারপর কুকুরটাকে পাঠায় শেয়াল ও খাটাস তাড়াতে। কুকুরও এক-দুই চক্কর দিয়ে প্রভুর কাছে এসে শুকনো খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়ে। ভোর রাতের দিকে একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে ফুটি খায় পেট পুরে, তখন নদীর হাওয়া তেতে ওঠে, জুম-পোড়া ছাই উড়তে থাকে আকাশ ভরে।

বিকেল হতে সেই বাতাস সমুদ্রের গন্ধ নিয়ে চারদিক জুড়িয়ে দেয়। বসন্তের সেই ঠাণ্ডা হাওয়া আবার হাসি দিয়ে ডাক দেয়—আমাকে মনে পড়ে? আরেক জন্মে আমি তোমার কি ছিলাম—ভেবে দেখো তো।

সেই রাতে গরমে তিষ্ঠানো দায় হয়ে পড়ল। সুন্দর গরমে ঘামে নেয়ে উঠেছে। নদীর দিক থেকে ঝুপ করে হাওয়া দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কুকুরটাও নেতিয়ে পড়েছে। সারাক্ষণ জিব বের করে ফ্যা ফ্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারারাত শেয়ালের উৎপাত, মাঝে মাঝে শেয়ালগুলো মানুষের মতো কথা বলে ওঠে, অথচ সুন্দর কিছুই বুঝতে পারে না। কুকুরের তাড়া খেয়ে তারা কি যে বলাবলি করে চলে গেল। আহা, সে যদি ঠিক সময়ে বুঝতে পারত তাহলে রমিজের দুধের ছেলেটি এভাবে মারা যেত না। দু-চারটা হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। শেয়ালগুলো খুব উৎসব করে খেয়েছিল।

শেষে সে চুপচাপ বিছানায় ফিরে এল। খেয়ে যাক শেয়ালে। সে পদ্মাসন হয়ে বসে মুহূর্তের মধ্যে চলে যায় অচেনা এক দেশে। কোনো এক জন্মে সে শেয়াল হয়ে জন্মেছিল। তখন অন্যান্য শেয়ালদের সঙ্গে শ্মশান, আখখেত, গৃহস্থ বাড়ির আঙিনা থেকে চুরি করে খেত। শেয়াল-জন্মে সে বুঝতে পারত কোথায় ফাঁদ পেতে রেখেছে, কোথায় ভালো ফসল হয়েছে।

ঘুমের মধ্যে সুন্দর স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে। ছুটে যায় খেতের দিকে। ইতিমধ্যে শেয়ালরা অনেক তরমুজ ও ফুটিতে দাঁত বসিয়ে পয়মাল করেছে। শেয়ালরা পানসে তরমুজ ও ফুটি খায় না। দু'এক কামড় দিয়ে ফেলে রাখে। এভাবে রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। ঠিক তখনই জেলেপাড়া থেকে নেমে আসে চোর। চারদিক তখন শান্ত। টিন পিটিয়ে পাহারা দেওয়ার কাজ থেমে গেছে, সব পাহারাদার চোখ বুজে স্বপ্নে ও ঘুমে আচ্ছন্ন। একটি মেয়ে জেলেপাড়া থেকে নেমে এল ফুটি চুরি করতে।

সুন্দরের ঘাসের বিছানার পাশে নুয়ে পড়েছে মেয়েটি। কুকুরটাও ঘুমিয়েছে কি কোথায় গেছে কে জানে। মেয়েটি তার কাছে মিনতি করে চাইল ফুটি ও তরমুজ।

দু'দিন ধরে কিছু খেতে পায়নি। সুন্দর এই উপকারটুকু না করলে সে আর প্রাণে বাঁচবে না।

সুন্দরের মায়া হলো। কিন্তু পরের জিনিস সে দেবে কি করে! গৃহস্থকে না বলে কিছু দেওয়া তো অন্যায়। মেয়েটি আবার অনুনয় করল, শেয়ালে খাওয়া হলেও চলবে। দাও গো!

ফুটি দিয়েই সুন্দরের মধ্যে অপরাধবোধ ক্রিয়াশীল হলো। পরের রাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। তার শরীর ও মন খিঁচিয়ে উঠল। কেন মেয়েটি তার কাছে আসে। শুধু তরমুজ—নাকি আরো কিছু চায়। দেওয়ার মতো কিছুই তো তার নেই। মাত্র গত রাতেই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয়। তার মনুষ্য-জন্ম

থেকে শেয়াল-জন্ম ভালো ছিল কিনা সেই তর্কে সে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। তার ওপর অভিমোহন জেলের বউ এসে তার কাছে সাহায্য চাইছে। মেছুনির শ্যামল যৌবনশ্রীও তাকে তেমন সন্তুষ্ট করতে পারে না। এভাবে পর পর কয়েক রাত তার কাছে এসে পেট পুরে খাওয়া ভিক্ষে চাইছে। এক জন্মের মধ্যে আরেক জন্ম এসে ভীড় করেছে। কুকুরটি নেতিয়ে পড়েছে। অসুখ-বিসুখ করেছে হয়তো। প্রতিদিন খাওয়া কী সহ্য হয়? এতদিন সপ্তাহান্তে খাবার জুটত, এখন দিনে দু-তিন বেলা খাওয়া সহ্য হয় না। সুন্দর ও কুকুর উভয়েই এ নিয়ে আলাপ করে। মাঝে মাঝে শুয়ে শুয়ে ডাক দেয়, আবার ঝিমিয়ে পড়ে, টঙের বাইরে কথা বলতে বলতে ঝিমোয়, আগুনও জ্বলতে থাকে। দূরে পাহারা দেয় কামাল, পুষ্প, কাশেম ও পুতু। আরও দূরে কে কে আছে কে জানে! সীমান্ত পাহারা দেয় সৈন্যরা, তবু চোরাকারবার হয়, আবার ধরা পড়ে জেল হয়। ওরা নিজেরাই পাহারা দেয়, নিজেরাই চুরি করে, আবার চোরও ধরে—সুন্দর ওদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে।

সুন্দর তিন বেলা খেতে পারে না। পেটের নাড়িভুড়িরা সহ্য করতে পারে না। কুকুরটা তো পারছে না বলে নেতিয়ে পড়েই আছে। শেষে সুন্দর ঠিক করল, আর নয়—এবার পালিয়ে যাই।

রাত শেষ হওয়ার আগেই সে খড়ের বিছানা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু শরীর চলতে চায় না। বাতাসে নুয়ে পড়া তরমুজ লতার মতো এলিয়ে পড়ে। সেই মেয়েটি আবার এল—গোটা দুই তরমুজ দাও না গো? সুন্দর প্রথমে চিৎকার করে প্রতিবাদ করবে ভাবে। চিৎকার করে বলবে বুঝি, ভাগ ভাগ। যেন শেয়াল তাড়াচ্ছে আর কি!

জেলের মেয়ে হরসুন্দরী নাছোড়বান্দা। দে না দুটো, বাঁচিয়ে রাখ আমারে। আমিও তোকে বাঁচাব।

হরসুন্দরী ফুটি চাইতে চাইতে ওর গায়ের ওপর ঢলে পড়ে। তার মাছ বেচা বন্ধ। নদীতে মাছ নেই। জাল নেই ছেলের, পানিও নেই নদীতে। হাওয়ায় হাওয়ায় যেন বাষ্প হয়ে গেছে খালবিলের জল। পুঁজি নেই যে শুঁটকির ব্যবসা করবে। দে না দু-চারটি ফুটি, তোর কথা জীবন জীবন মনে থাকবে। আরেক জীবনে হলেও তোর ঋণ শোধ করব।

সুন্দর চুপচাপ বসে বসে শোনে। হরসুন্দরী তার কানের কাছে গিয়ে আবার বলে আর সে বধিরের মতো কিছুই শুনতে পায় না। বসন্তের হাওয়ার মতো তো সে গন্ধ বয়ে বেড়াতে পারে না। সূর্যের তেজ নিয়ে চাঁদের মতো মিষ্টি আলো বিকিরণও করতে পারে না। সে যেন শুধু দুর্গন্ধের পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে পড়ে। তার অতীত জীবন একবার উঠে আসে, নানা স্মৃতি ভেসে বেড়ায়।

আচ্ছন্নের মতো সে আধখানা খাওয়া ফুটি ও তরমুজ তুলে দেয় হরসুন্দরীর হাতে। তারপর বলে পালা, আর কোনোদিন আসবি না, ভাগ ভাগ!

পরদিন থেকে সুন্দর ভালো মতোই অসুখে পড়ল। কুকুরটাও পড়েছে নেতিয়ে। সুন্দর শুয়ে থাকে তরমুজ খেতের টঙের মাচায়। কুকুরটাও। খেতের মালিকের লোক ভাত নিয়ে আসে। সে চুপচাপ পড়ে থাকে। খেতের মালিক পাকা ফুটি তুলে বাজারে নিয়ে যায়, যাওয়ার সময় বলে যায় সব দেখেশুনে ঠিকঠাক রাখতে। সে আচ্ছন্নের মতো লতাগুল্মের গলা জড়িয়ে আশ্রয় খোঁজে।

পরদিন আর শক্তি থাকে না পাহারা দেওয়ার। বসন্তের হাওয়া ভেসে যায় খেতের ওপর দিয়ে। জুম-পোড়া ছাই উড়ে যায়। দাঁড় বেয়ে নৌকো চলে উজান বেয়ে, জোয়ার আসে হাওয়া নিয়ে। সুন্দর পড়ে থাকে। কুকুরটাও শুয়ে শুয়ে বসন্তের দিন গোনে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে সুন্দর, কষ্ট করে উঠে ভাত খেতে বসে, কিন্তু একগ্রাসও মুখে তুলতে পারে না। পেটটা যেন দম মেরে আছে। কুকুরও খায় না। সেই রাতে পাহারা দেওয়া আর হয়ে ওঠে না। কুকুরটা লেংচাতে লেংচাতে শেয়াল তাড়িয়ে আসে।

সুন্দর খোলা আকাশের নিচে শুকনো খড়ের শয্যায় পড়ে থাকে। কোনো এক জন্মে সে হয়তো মানুষ-রূপে জন্মেছিল, মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছিল, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছিল—আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করছে। হয়তো কুড়োল হাতে পাছপাদপ কেটেছিল। উপকারী গাছের ডালপালা কেটে উলঙ্গ করেছিল। বিকেলের আকাশ ডাক দেয়, নীল চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে। সুন্দর অনড় পড়ে থাকে তবুও।

রাত বাড়তে থাকে। শেয়াল এসে খেতের ফসল খেয়ে যায়। কুকুরটার ডাকও শোনা যায় না। সুন্দর খড়ের বিছানায় পড়ে থাকে। তবুও তার একরকম ভালো লাগে। শরীরে চটচটে উষ্ণতা অনুভব করে, জ্বর আসে। শেয়াল এসে তার গা চেটেপুটে দেয়। অথবা তার কুকুর বন্ধু, অথবা হরসুন্দরী কিনা কে জানে! হয়তো জ্বরের ঘোরে হরসুন্দরী এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, ডেকে নিয়ে যেতে চেয়েছে নিজের ঘরে। হয়তো কুকুরটা খোঁকিয়ে উঠেছে হরসুন্দরীর প্রতি, অথবা কি কি ঘটেছে মনে করতে পারে না কিছুই। তেষ্টায় জল দিয়েছে যেন কে? আর কিছুই মনে পড়ে না। বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পর সুন্দর পাড়ার দোকানের গুদাম ঘরে আশ্রয় নেয়। দু-একজন এসে তাকে দেখে। হরসুন্দরী মাছ বেচতে এসে খবর নিয়ে যায়। বৃষ্টি হয়ে

গেছে কয়েকদিন। মাছেরা ডিম ছাড়তে নদীর উজানে ছোটে। হাতজাল নিয়ে লোকজন নদী ও খালে ছোটাছুটি করে। সে প্রলাপ বকতে থাকে বিড়বিড় করে। প্রলাপের একটি কথাই শুধু বোঝা যায়, মানুষ মানুষ। আর কেউ দেখে না সুন্দরকে। সে অসুস্থ তাই কিছুই বলে না, সাহায্যও চায় না। মাঝে মাঝে কুকুরটাকে ডাকে, কোনো মতে উঠে পানি খাওয়ায়, নিজেও খায়। হরসুন্দরী আসলে তার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেয় সে। জীবনে তার একটি পাপ খেতের মালিককে না বলে হরসুন্দরীকে ফুটি দেওয়া, তবুও তার সান্ত্বনা শেয়ালের উচ্ছিষ্ট দিয়ে সে হরসুন্দরীকে বাঁচিয়েছে। নইলে হয়তো হরসুন্দরী চুরি করত, খেতে না পেয়ে মরতে বসত অথবা।

কিন্তু দোকানের গুদামে তো এভাবে থাকা যায় না। দোকানদার মঝু একজন রুগ্ন লোককে ওখানে রাখতে চায় না। এক সময় সে দোকান পাহারা দিত মঝুর সঙ্গে। সেই সুবাদে আর কদিন সহ্য করবে মঝু। সুন্দর দিনের পর দিন তার পুরনো দিনের স্মৃতি ফিরে পায়। সবকিছু মনে পড়ে যায়। মা-বাবাকে হারিয়ে খুব ছোটোকাল থেকে অসহায় অকূলে পড়েছিল। মামার বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও একদিন বেরিয়ে পড়ল। এক সময় শুরু হলো শ্রমণ জীবন। সে একাগ্র হয়ে সাধকের জীবন খুঁজল। কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে সে-জীবন থেকেও সে প্রতারিত হয়। তার মস্তিষ্কে গোলযোগ শুরু হলো। এখন সে পড়ে আছে একটি গুদামঘরে, তাকে দেখার কেউ নেই, মঝু বিরক্ত হচ্ছে, হরসুন্দরী তাকে করুণা করছে।

আস্তে আস্তে ক্ষুধা তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেল। খুব ইচ্ছে করছে থালা-ভর্তি ভাত নিয়ে বসে। পিঁড়ি পেতে শাক-সবজি ও ডাল-মাছ দিয়ে খায়! ডালে একটু ফোড়ন, গরম ভাতে একটু ঘি, পুদিনা পাতার চাটনি, শুঁটকির ঝাল—কতদিন সে পেট ভরে খেতে পায় না, কেউ মমতা ভরে খেতে ডাকে না, এটা নাও ওটা খাও বলে কৃত্রিম রাগে শাসন করে না কেউ। খিদেয় ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, গা গুলিয়ে বমি আসে।

আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে আসে। মঝু দূর থেকে দেখে যায়, গজগজ করে। কুকুরটা নেতিয়ে আছে। আপদটাকে প্রথমে ঘরে ঢুকতে দেয়নি মঝু। পরে করুণাবশত হোক কিংবা পাহারাদারের সঙ্গী ভেবে হোক রেহাই দিয়েছে। পিট-পিট তাকিয়েও দেখে না আর, অনেকক্ষণ আগে বাইরে নিয়ে পানি খাইয়ে এনেছিল সুন্দর, সেই থেকে পড়ে থেকে এ-কাত ও-কাত হয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। এক জায়গায় ঠায় পড়ে বেদম ঘুমাচ্ছে নাকি তার মতো মটকা মেরে পড়ে আছে কে জানে! আরেক জীবনে কুকুরটি তার বন্ধু ছিল হয়তো, মনে পড়ে যায় কুকুর-জন্মের মতো এক জীবনের কথা।

অনেক কষ্টে উঠল সে। শরীর চলে না, দুলছে। কুকুরটাকে ডেকে তুলল, বেরিয়ে গেল মঝুর সামনে দিয়ে। মঝু একবার আড়চোখে তাকাল শুধু, কিছু বলল না। ভাবল আবার তো আসবে, যাবে আর কোথায়! বিহারে গিয়ে লাভ নেই, রাতে সেখানে খাবার মিলবে না। কার বাড়িতে যাবে। সত্যি, যাবেই বা কোথায়? যখন সে শ্রমণ ছিল গ্রামের সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত। পাত্র ভরে অন্ন দিত, উৎকৃষ্ট খাবার দিত সকাল ও দুপুরে। রাতে তো কিছু খাওয়ার নিয়ম ছিল না, সাধনা করলে তার দরকারও পড়ে না।

আজ কতদিন ধরে ভাত খায় না সে। কতদিন তাও মনে পড়ে না। শরীর গুলিয়ে পিত্তি বেরিয়ে আসে। পেট আর পিঠের চামড়া এক হয়ে গেছে, পেটের ভেতরে কিছু চালান করতে না পারলে সেই চামড়া খুলবে না। খাওয়ার জন্যে সে হন্যে হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে শুরু করল। মুখ ফুটে বলতে পারে না। এখন তার মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল, তার গত এবং উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের সবকিছু ভাসছে চোখের সামনে। তার শ্রমণ জীবনের শুদ্ধাচার, মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্যে শ্রমণ জীবন ত্যাগ—সবই মনে পড়ে। জীবনকুমারের বাড়িতে গেল সুন্দর। বাড়ির সবাই খেয়ে নিয়েছে। কাজেই তার সঙ্গে দু-চারটা কথা বলে তাকে বিদায় করে দিল। সোনাদের বাড়িতে গেলে প্রথমে তারা হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয় তার হাতে। খালি পেটে তামাক খেলে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটে যাবে সে জানে। কিন্তু লোভ সামলানোও মুশকিল। বসন্তের বাড়িতে সোজা না করেছিল। এভাবে আরও কয়েক বাড়িতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

চরে তরমুজ-ফুটিও নেই যে গিয়ে হাত পাতবে। বোশেখ শেষ, জষ্টির ঝড়-বাদলা শুরু হয়েছে বর্ষার মতো। যাদের বাড়িতে সে কাজ করেছিল তারাও তার দিকে তাকায় না, ভাবে আপদটা গেলে বাঁচি। তাছাড়া এখন তো সে সম্পূর্ণ সুস্থ, সবকিছু মনে করতে পারে। কুকুরটাও তাকে বুঝতে শিখেছে, লেংচাতে লেংচাতেও পিছু পিছু হাঁটছে, পাড়ার লোকজন যে তার দিকে নজর দিচ্ছে না তা বুঝে নিতে তার কষ্ট হয় না।

অনেক ভাবল সে। হরসুন্দরী একদিন না খেয়ে মরার কথা বলে সাহায্য চেয়েছিল বলে সহ্য করতে পারেনি। আর একদিন এসে জীবনের কথা শুনিয়েছিল, অন্যদিন যৌবন ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিল। অনেক ভাবল সে। অনেক ভেবে মন্দিরে পৌঁছল গভীর রাতে। খিদেয় তখন তার বোধ-বুদ্ধি ও সংজ্ঞা নেই। কুকুরটাও আগেভাগে গিয়ে উঠেছে বারান্দায়।

সিঁড়ির গোড়া বেয়ে মালতীলতার ঝাড় উঠেছে। কামিনী ও অশোক গাছের সারি দাঁড়িয়ে আছে বারান্দা ধরে। মন্দিরের দেয়ালের গায়ে বুদ্ধের জন্ম ও জীবনকাহিনী ফ্রেসকো করা। বুদ্ধের পাঁজর-সর্বস্ব গান্ধারার মূর্তিটির দিকে

নিজের অজান্তে সে এগিয়ে গেল। সেই আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধের একান্ত প্রিয় সহচর ছিলেন ভিক্ষু আনন্দ। আর এই জন্মে তার নাম কেন সুন্দর হলো? কুকুরটা কেন তার কাছছাড়া হয় না?

আস্তে আস্তে সে মন্দিরের গোলবারান্দায় উঠে তাকাল। গোলবারান্দার পেছনে চলে গেল। দেয়ালের গায়ের ফ্রেসকোর গল্প তাকে পেয়ে বসল। চণ্ডালিকা জলদান করছে তৃষ্ণার্ত ভিক্ষু আনন্দকে। গণ্ডুস ভরে পান করলেন তিনি! সেই চণ্ডালিকা ভুল বুঝল, মোহ এসে গ্রাস করল চণ্ডালিকাকে, ভাবল সেই বুঝি ভালোবাসা।

সুন্দর শুয়ে পড়ল সেখানে। কুকুরটা কোথায় কে জানে! জ্বরে-তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়। ওঠার শক্তি নেই—হরসুন্দরীর কথা মনে পড়ে। এপাশ-ওপাশ করে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, দেয়ালের গায়ের কাহিনীর ভগ্নাংশ—কুকুর-জাতক, জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী—কল্পান্ত শুরু হয়ে যায়। হরসুন্দরী ছুটে আসে তাকে দেখতে।

রাত কেটে যায়। সকাল হতেই ঘুম আসে চোখে। সারাদিন আর হুঁশ নেই। লোকজন মন্দিরে এসে তাকে দেখে যায়। সে বেহুঁশ পড়ে থাকে। দিনের পর দিন কেটে যায়, আবার রাত নামে। সে স্বপ্নে দেখে—কে যেন তাকে গণ্ডুস ভরে জলদান করছে। তার সমস্ত শরীর শীতল স্পর্শে জুড়িয়ে যায়। কে যেন আদর করে ডাল-ভাত তুলে ধরে মুখের কাছে। তৃপ্তি ভরে সে খায়। দু'মুঠো গরম ভাত, ডাল শাক মাছ—জীবনে এত তৃপ্তি ভরে সে কোনোদিন খায়নি। ঘোমটা মাথায় হরসুন্দরী তাকে খেতে দিয়েছে। এত মমতা কেউ তাকে কখনো দেখায়নি, এত ক্ষুধা কোনোদিন অনুভব করেনি, তৃপ্তিও পায়নি কোনোদিন। হরসুন্দরী ডাকল, আর কি খেতে ইচ্ছা করে বলো। পেট ভরেছে তো!

এই অবস্থায় এক রাতে ওষুধ-পথ্য কিছু না পেয়ে পাঁচ দিন থাকার পর সুন্দরের মৃত্যু হলো। একই সময়ে কুকুরটিও গেল। ভোরে মন্দিরে আগত সবাই সে-দৃশ্য দেখল—কুকুরকে জড়িয়ে ধরে সুন্দরের মৃতদেহ পড়ে আছে।

১৯৮১

যুগলবন্দি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

'আসগর!'

কার্পেটে বসে আসগর হোসেন তখন খালি সব বোতল থেকে ফোঁটা ফোঁটা তলানি ঢালছিল নিজের জিভে। মস্ত ড্রয়িংরুমের আরেক মাথায় সরোয়ার বি কবিরের হুইস্কি-শোষা গলা গমগম করে উঠলে প্রথমে সাড়া দেয় বারান্দায় বসে থাকা অ্যালসেশিয়ানটি। তারপর চমকে উঠে আসগর। অতিথিদের বিদায় দিয়ে সরোয়ার কবির এই তো ভেতরে গেল, পনেরো মিনিটের মধ্যে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা আঁচ করতে পারলে এখন বোতল ঠোঁটে ধরার সাহস আসগরের হয়? মিনিট-দশেক আগেও বারান্দায় বসে সে আরগসের পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, সরোয়ার কবির ফিরে আসবে জানলে তাই অব্যাহত রাখা যেত। আসগরের লাকটাই এরকম, সায়েবের ফেভারিট কাজগুলো যখন করে সায়েব তখন লক্ষই করে না। সরোয়ার কবিরের গলা পর্যন্ত এখন ডিম্পলে শিভাজ রিগ্যালে টইটম্বুর, সাহিত্য কি কোষ্ঠকাঠিন্য কি নিজের ব্রিলিয়ান্ট অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার নিয়ে কথাবার্তা শুরু করে তো রাতটা বসে বসেই কাবার।

টাল সামলাতে সামলাতে আসগর উঠে দাঁড়ায়, 'জী?'

তার গোপনে বোতল চোষার দিকে সরোয়ার কবির ফিরেও তাকায় না। 'বোসো' বলে নিজে লম্বা একটা সোফায় বসে আধশোয়া হয়ে। এখন সহজে উঠবে না। আসগর আড়চোখে সার্ভে করে : না, চেহারা দেখে তার মুড বোঝবার জো নাই। তবে মিসেস জেসমিন বি কবিরের মেজাজ বোধহয় ফর্মে নাই, বেডরুমে লোকটা সুবিধা করতে পারেনি। আহা, এতবড়ো জাঁদরেল অফিসার—যার হাত দিয়ে লক্ষপতি কোটিপতিদের রোজগারের খানিকটা চালান হয়ে আসে রাষ্ট্রীয় তহবিলে—দেখো বৌয়ের মেজাজের জন্য মাসে কম করে হলেও চার-পাঁচ দিন তাকে কাটাতে হয় ড্রয়িংরুমে, স্রেফ সোফায় কি ডিভানে আধশোয়া অবস্থায়। লোকটার এই ভোগান্তির কথা ভেবে আসগর এতটা দুঃখিত হয় যে তার দুঃখ নিজেই বরণ করে নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এ ধরনের দুঃখকষ্ট ভোগ করার কপাল যে তার কবে হবে!

'আসগর, তোমাকে তো একটু কষ্ট করতে হয়। পারবে?'

কুশনঢাকা মোড়ায় বসে বসেই আসগর অ্যাটেনশন হয়। একই সঙ্গে অভিভূত চোখে তাকায়, সায়েব কিরকম পোলাইট, কি তার এটিকেট। আসগর হোসেন কি?—না, তার বোনের চাচাতো না মামাতো দেওরের বন্ধু। এটা কোনো সম্পর্ক হলো? আসলে তো চাকরির উমেদার। তাকে সোজাসুজি হুকুম করলেও পারে। তা না, ভারি গলায় কি বিনয়! কিন্তু এ-ধরনের জবাবে কি করতে হয় না জানায় আসগর কথা বলে না। সরোয়ার কবির জিগ্যেস করে, 'রাত অনেক হয়েছে, না?'

'জী, পৌনে একটা, বারোটা তেতাল্লিশ।'

'মোটে?'

সরোয়ার কবির হাসলে আসগরও অগত্যা হাসে, 'না, রাত তেমন হয়নি, শীতের রাত, এখনো সারাটা রাত্রি পড়ে আছে।' বোঝাই যাচ্ছে, হুইস্কির বোতল আনতে তাকে এখন যেতে হবে মাইল-পাঁচেক দূরে। অসময়ে এসব কাজ সরোয়ার কবির তার অফিসের লোক দিয়ে করায় না, অফিসে সে দয়ালু ও বিবেচক বস। বছর-খানেক এসব কাজ করেছে তার বোনের চাচাতো না মামাতো দেওর। দশ-বারো মাসের একনিষ্ঠতার পুরস্কারও তার জুটেছে, সরোয়ার কবিরই বলে কয়ে তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে অ্যামেরিকান এক জাহাজ কোম্পানিতে। ঐ সিকানদারের থুতেই আসগর এই বাড়িতে ঢোকে, লেগে থাকতে পারলে তারও হবে। এখন বোতল নিয়ে এলে একটা অন্তত সরিয়ে রাখতে হবে, কোথায় কিভাবে রাখবে এই নিয়ে আসগর একটু পরিকল্পনা করে।

'শীত কোথায়? দেখছো না পাঞ্জাবি পরে কেমন ঘামছি।' তা পেগের পর পেগ শিভাজ রিগ্যাল চালালে আসগর ন্যাংটা হয়ে এতক্ষণে রাস্তায় নামতে পারে। সরোয়ার কবির বলে, 'বসন্তের হাওয়া ফিল করছো না?'

'জী, আর মাস-খানেকের মধ্যেই ফাল্গুন মাস এসে পড়ছে।'

'রাইট। ফাল্গুন আসছে, না?'

'জী, নেকস্ট মান্থ। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি।'

'দ্যাটস রাইট। এনিওয়ে, তোমাকে একটু বদার করবো।'

'না স্যার, না স্যার। আগ্রাবাদ যেতে হবে?'

তাকে কবির ভাই বলে ডাকতেও তার কোনো অর্ডার ক্যারি আউট করার সময় আসগর স্যার বলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

'আগ্রা দিল্লি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো। কয়েকটা কমলালেবু জোগাড় করতে হয়। এক্ষুনি দরকার।'

'কমলালেবু? এখন?'

'হ্যাঁ। পিঙ্কির, আই মিন তোমার ভাবীর হঠাৎ কি হয়েছে—কমলালেবু খেতে ইচ্ছে করছে। নর্ম্যালি ও রাতে কিছু খায় না, নট ইভন এ গ্লাস অফ ওয়াটার, পানিতেও নাকি ফ্যাট বাড়ে। আমি বারবার করে বললাম এত ড্রিঙ্ক করার পর খালি পেটে থেকো না, অন্তত ফলটল কিছু খাও। তো ফ্রিজ খুলে দেখি আপেল আছে, কলা আছে, বাট নো অরেঞ্জ।'

'আপেল খেলে হয় না?' জিজ্ঞেস করেই আসগরের ভয় হয় যে এই কথায় সরোয়ার কবির তাকে কর্মবিমুখ অলস ও অপদার্থ যুবক হিসাবে চিহ্নিত না করে। সঙ্গে সঙ্গে তাই একটু মেরামত করতে হয়, 'রাত্রে কমলালেবু খেলে অনেক সময় অ্যাসিড হতে পারে।'

'আপেল থেকেই বরং অ্যাসিড হওয়ার চান্স বেশি।'

এরপর কলা সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়াটা রিস্কি। আর এদের সোসাইটিতে কলার পজিশনও ওর কাছে স্পষ্ট নয়।

সোফায় মাথা এলিয়ে দিয়ে সরোয়ার কবির বলে, 'শি ওয়ান্টস অরেঞ্জ। ইট হেল্পস হার টু রিডিউস হার ওয়েট। টক তো চর্বিনাশক।'

'জী, টক সব সময় চর্বিনাশক।' সরোয়ার কবিরের ইংরেজির মতো তার কঠিন কঠিন বাঙলা কথাও রপ্ত করার জন্য আসগর সদা সচেতন।

'গাড়িটা বের করো', আসগরের হাতে ১০০ টাকার নোট গুঁজে দিতে দিতে সরোয়ার কবির বলে, 'ড্রাইভার বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বেচারা সারাটা দিন ডিউটি করেছে, ড্যাম টায়ার্ড। দ্যাখো তো ওঠে কিনা।'

'আমি নিজেই বরং চালিয়ে নিয়ে যাই।'

'গুড।' টেবিলের শেলফ থেকে ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ টেনে নিতে নিতে সরোয়ার কবির ছোট্টো করে হাসে, 'ভেরি গুড। যাও।'

গাড়ি বার করার সময় অ্যালসেশিয়ানটা গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করলে আসগর ডাকে, 'আরগস।' দুর! ডাকটা হার্শ হয়ে গেল। সরোয়ার কবির শুনে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মোলায়েম ও আদুরে করে বলে, 'আরগস।' এবার গলাটা বেশি নিচু হয়ে গিয়েছিল। সরোয়ার কবির শুনলো তো?

না, চকবাজারে ফলের দোকান একটিও খোলা নেই। এত রাতে তার জন্যে কমলালেবু নিয়ে বসে থাকবে কোন শালা? সুতরাং ডানদিকে মোড় নিয়ে চাকা গড়িয়ে দিল দক্ষিণ-পূর্বে। ড্রাইভটা ভারি চমৎকার। রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। সারমন রোড দিয়ে এতবার গেছে, জামান ইন্টারন্যাশনালের পুরনো জিপ নিয়ে সিকানদারের সঙ্গে যখন ড্রাইভিং শেখে তখনো এই রাস্তায় মেলা গাড়ি চালিয়েছে। কিন্তু এরকম অদ্ভুত লাগেনি কোনোদিন। কোথাও পাতলা কোথাও ঘন কুয়াশার আড়ালে পাহাড়গুলো ভারি রহস্যময়। জয় পাহাড়ের এখানে

ওখানে আলো জ্বলে, কুয়াশায় সেইসব আলো এখন ঝাপশা। কখনো কখনো একটি আলো দুটো তিনটে আলোয় ভাগ হয়ে লুকোচুরি খেলে। গাড়ির হেডলাইটের আলো কুয়াশা ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিজেই গলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, ফ্যাকাশে অন্ধকার বড়ো অপরিচিত মনে হয়। গাড়ির জানলা খোলা, সেদিক দিয়ে পাহাড়ের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস এসে মুখে লাগে। জানলাটি উঠিয়ে দিতে বাধো বাধো ঠেকে, মনে হয় কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারে। পাহাড়ের গায়ে গাছগুলো সরে সরে যাচ্ছিল, হঠাৎ করে চোখ পড়ে একটু দূরে পাহাড়ের মাথায় ন্যাড়া ঢ্যাঙা গাছের পাতা-ঝরা ডালে ডিমে তা দেওয়ার ভঙ্গিতে বসে রয়েছে কৃষ্ণপক্ষের কালচে রক্তের রঙের চাঁদ। ডাল ভেঙে শালার চাঁদ পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়লে মহা কেলেঙ্কারি! জোর করে সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে আসগর গাড়ির স্পিড বাড়ায়। দুত্তোরি! ভূতের ভয় কি শালা ফের চাগিয়ে উঠল নাকি? বছর-চারেক আগে পর্যন্ত তাকে কাটাতে হয়েছে মফস্বলে, প্রায় এঁদো মফস্বল, পোস্ট অফিসের সঙ্গে লাগোয়া পোস্টমাস্টার বাপের টিনের বাড়িতে। শোবার ঘর থেকে কলপাড়ে যেতে সেখানে উঠোন পেরোত হয়। এখন অনেক উঁচুতে ন্যাড়া গাছের রোগা ডালে কালচে লাল চাঁদের ডিম পাড়া দেখে উঠোনের কলাগাছের ঝাড় শিরশির করে কাঁপতে লাগল। দুর! এখন আবার এসব আদিখ্যেতা কেন? এসব ভয় কি এখন পোষায়? তবু কমলালেবু জোগাড় করার অভিযানের চেয়ে এই বুক-ছমছম অনেক ভালো।

রিয়াজউদ্দিন বাজারের কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। গাড়ির নরম আওয়াজের তাদের কাঁচা ঘুম ভাঙে এবং আসগরের দিকে টার্গেট করে মহা ঘেউ ঘেউ শুরু করে। কুত্তার বাচ্চা! একেকটার চেহারা সুরৎ কি! একবার চোখে পড়লে আর তাকাবার রুচি হয় না। ইচ্ছা করে সব ক'টাকে লাথি মেরে স্টেশন রোড, স্ট্রান্ড রোড ডিঙিয়ে কর্ণফুলিতে নামিয়ে দেয়। কিন্তু ওদের ওপর আসগরের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কারণ কোরাস ঘেউ ঘেউ-তে কাজ হলো, একজন লোক দোকান খুলে বাইরে এল। দোকানের কর্মচারী গোছের লোক। প্রথমে পাত্তাই দেয় না। আসগর তখন ইব্রাহিম সওদাগরের নাম বলে। পোর্ট থেকে কয়েকবার গোপনে টু-ইন-ওয়ান এনে আসগর তার কাছে বিক্রি করেছে। তার নাম বলায় কাজ হয়।

তারপর গাড়ি নিয়ে সোজা মাদারবাড়ি। সরোয়ার কবিরের হাতে কমলালেবু একটু দেরিতেই পৌঁছানো ভালো। রাত দেড়টায় কমলালেবু জোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়। সায়েবরা, আরামে থাকো, বোঝো না কত ধানে কত চাল! কিন্তু মাদারবাড়িতে আসগরদের বাসায় সবাই গভীর ঘুমে মগ্ন। বাবা যখন থানা বা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পোস্ট অফিসে কাজ করত তখন যত রাতই

হোক তাদের দু-কামরায় বাসায় টিনের চালে টিকটিকি হাঁটলেও 'কে? কে?' বলে লাফিয়ে উঠত। আর সারা জীবন কিপটেমি করে জমানো পয়সায় দালান তুলে লোকটায় ঘুম কিরকম গাঢ় হয়েছে। রিটায়ার করার পর কাজ নাই কম্ম নাই খালি ঘুমাও, না? দাঁড়াও তোমার ঘুমের ঘোর ঘোচাচ্ছি, দাঁড়াও। আসগর দরজায় ধাঁই ধাঁই করে ঘুষি মারে আর চ্যাঁচায়, 'দরজা খোলো, দরজা খোলো না!'

ঘুমঘুম চোখে দরজা খোলে আসগরের মা, ছেলের বিরক্তির শিকারও হতে হয় তাকেই, 'ঘুমালে তোমরা কি সব মরে যাও নাকি? কড়া নাড়ি, দরজায় ঘুষি মারি, তবু কারো ঘুম ভাঙে না কেন! কলিং বেল বাজে না কেন? বাল্‌ব খুলে রেখেছো নাকি?' কলিং বেলের বাল্‌ব খুলে রান্নাঘরে লাগানো হয়েছে, আজকাল বাল্‌ব বড্ডো ফিউজড হয়, বাল্‌ব কেনার কথা বললেই আসগরের বাপ খ্যাকখ্যাক করে। কিন্তু এত বকাবকিতে ঘাবড়ে যাওয়ায় মা জবাব দিতে পারে না, হাই তুলতে গিয়ে তার মাড়ির হাড় আটকে যায়। আবার সেটাকে সামলাতেও হয় ভয়েই, লালাজড়ানো জিভে মা বলে, 'রান্নাঘরের বাল্‌বটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল।'

'ওটাও কি আমাকেই আনতে হবে? বাড়িতে আর লোক নেই?'

বাবা ছাড়া বাড়িতে পুরুষমানুষ বলতে আর কে আছে? আসগরের ছোটো ভাই আজহারটা একেবারেই ছোটো, ক্লাস ফোরে পড়ে। একমাত্র বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, সে থাকে ঢাকায়। সুতরাং বাল্‌ব না কেনার দায়িত্ব পড়ে বাবার ঘাড়েই। ওদিকে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যরাত্রির কথপোকথনে অংশ নেওয়ার জন্য গোলাম হোসেন বিছানা ছেড়ে এখানেই আসছিল, আসগরের সঙ্গে তার একটু দরকারও আছে। কিন্তু ছেলে এবার তাকেই সরাসরি ধমক দিয়ে বসবে অনুমান করে বেচারা করিডোরের সঙ্গে খাবার ঘরে চেয়ারে বসে পড়ে।

মাকে পাশ কাটিয়ে খাবার ঘরে ঢুকে আসগর রেফ্রিজারেটরের দরজা খোলে। মা বলে, 'ভাত খা, একটু বোস, তরকারি গরম করে দিই।'

আর খাওয়া। রেফ্রিজারেটরের ভেতরটা দেখে আসগরের মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। রাজ্যের হাঁড়িকুড়ি আর লাউয়ের ফালি আর বেগুন আর পুঁইশাকে তাকগুলো ঠাসা। এইসব ছোটোলোকি জিনিসপত্র রাখার জন্য কি এত রিস্ক নিয়ে পোর্ট থেকে আসগর ফ্রিজটা সরিয়েছিল? সেই অ্যামেরিকান জাহাজের এক সেলারকে পটাতে কাঠখড় কম পোড়াতে হয়নি, তারপর কাস্টমসের লোক, তারপর পুলিশ—ঝামেলা কম হয়নি। আর সেই ফ্রিজে কিনা রাখা হয় এইসব অখাদ্য? ফ্রিজের তাক থেকে হাত দিয়ে লাউয়ের ফালি, পুঁইশাক ও বেগুন গড়িয়ে নিচে মেঝেতে ফেলে আসগর সেখানে সাজিয়ে রাখে ডজন-খানেক কমলালেবু। আজ দু-ডজন দিয়ে সরোয়ার কবিরকে সামলানো যাবে।

মা উপুড় হয়ে তরকারিগুলো তুলে টেবিলে রেখে দেয়। রেফ্রিজারেটর বন্ধ করে আসগর ফিরে তাকালে মা বলে, 'খাবি না বাবা?'

'ওইসব?'

'পাগলা!' ঘুম-ভাঙা ঘরঘরে গলায় মা বলে, 'ট্যাংরা মাছের তরকারি আছে, বেগুন দিয়ে রাঁধা, পুঁইশাকের চচ্চড়ি আছে, ভাত খা।' এসব আসগরের প্রিয় খাদ্যের অন্তর্গত। কিন্তু মেনু শুনে রাগে দুঃখে তার গা জ্বলে যায়। মায়ের দিকে তাকায় না পর্যন্ত।

গোলাম হোসেন ভয়ে ভয়ে ছেলের তড়পানি দ্যাখে। তার রোগা কালো শরীরে ভয়টা বড়ো স্পষ্ট। বাপের এই ভয় আসগর অনুমোদন করতে পারে না। ছেলেকে বাপ এত ভয় পাবে কেন? মাসখানেক আগে সরোয়ার কবিরের বাপকে দেখল। সে একেবারে আলাদা ধরনের বাপ। কি জাঁদরেল চেহারা, ব্রিটিশ আমলের পাকিস্তানী আমলের হাই গভর্নমেন্ট অফিশল। ঢাকা থেকে সেকেণ্ড ফ্লাইটে এল, এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল আসগর। গাড়িতে উঠতে উঠতে জিগ্‌গেস করল, 'টুকু নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত? ফাইনান্স সেক্রেটারি তো এখন চিটাগাঙেই আছে?'—দেখো তো কত বড়ো ছেলে, তো তার সম্বন্ধে স্রেফ টুকু ছাড়া আর কিছুই বলল না। আর গোলাম হোসেন ঘাড় নিচু করে কেমন মিনমিন করে, 'বাবা—সিমেন্ট তো পাওয়া যাচ্ছে না, আজ সারাদিন ঘুরলাম।

'পাওনি?'

'না। নতুন ঘরের ফ্লোরের কাজ বন্ধ, মিস্ত্রীকে বসিয়ে রেখে খালি খালি পয়সা দেওয়া হলো।'

আসগর জানে বাপের দুটো কথাই ডাহা মিথ্যা। সিমেন্টের খোঁজই সে করেনি, সিমেন্ট পেলে তো পয়সা যেত নিজের গাঁট থেকে আর মিস্ত্রী সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করলেও মজুরি দিতে তার বুকটা ছিঁড়ে যায়, আর সে কিনা বসিয়ে রেখে মিস্ত্রীকে পয়সা দেবে? অত সোজা? তবে বাপের এই মিছে কথা বলার জন্য তার ওপর রাগ করার সুযোগ পেয়ে আসগর খ্যাঁক করে উঠল, 'খালি খালি দণ্ড দাও কেন? সকালে না করে দিতে পারলে না?'

গোলাম হোসেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলে তৃপ্ত আসগর স্বর নামায়, 'তুমি সিমেন্ট পাবে কোথায়? সোমবার এগারোটার দিকে কালীবাড়িতে ইয়াজউদ্দিনের দোকানে যেও। বলা থাকবে। আমার নাম বললে পঁচিশ বস্তা সিমেন্ট ছাড়বে।'

'দাম?' গোলাম হোসেন অন্যদিকে তাকিয়ে জিগ্‌গেস করে। ইস! লোকটার ছোটোলোকমির কোনো সীমা নাই! 'আগেই দেওয়া থাকবে।'

'ঠেলাগাড়ি করে আনবো তো?' গোলাম হোসেনের এই উদ্বেগের জবাবে হিপ-পকেট থেকে দশ টাকার তিনটে নোট টেবিলে ছুঁড়ে রাখে আসগর। সকালবেলা সরোয়ার কবির একশ টাকার হিসাব চাইলে একটু মুশকিল হবে। টাকা দিয়ে হিসাব চাইবার লোক অবশ্য সরোয়ার কবির নয়। কিন্তু করবে কি—এরপর দু-তিন দিন এটা আনতে বলবে, ওটা আনতে বলবে, তবে টাকা দেবে না। মানে, মনে মনে শালাদের হিসাবপত্তর সব ঠিকই থাকে। এই টাকা কিভাবে ম্যানেজ করা যায় ভাবতে ভাবতে চেয়ারে ডান-পা রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আসগর কমলালেবুর খোসা ছাড়ায়।

'ভাত খা। এমন লেবু খেলে ভাত খেতে পারবি না।' মার এইসব বাঙাল মার্কা কথাবার্তা সে আর কত সহ্য করবে? এদের ধারণা গাদা গাদা ভাত না গিললে খিদে মেটে না। সরোয়ার কবিরের বৌ কেমন দিনের পর দিন ভাত না খেয়ে কাটায়, তাতে কি তার শরীর ভেঙে পড়েছে, না আরো সুন্দর হয়ে উঠছে? সরোয়ার কবির যে বলে, ঠিকই বলে, ডেফিনিট এইম না থাকলে লাইফে কিচ্ছু করা যায় না। স্লিম হওয়া হলো জেসমিন কবিরের জীবনের আকাঙ্ক্ষা, তার চিন্তাভাবনা, তার সুখ-দুঃখ। বলা যায় তার দর্শন—সবই একটি অভিন্ন কেন্দ্রের দিকে ধাবমান—ক্লাবে পার্টিতে সোসাইটিতে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা। এজন্য তাকে কিছু খেসারত তো দিতেই হবে। খাওয়া কন্ট্রোল করা তো আছেই, যখন তখন ঘুম পেলেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলে চলবে না, ঘুম পেলেও নয়, সেক্স ফিল করলেও নয়। ক্ষুধা নিদ্রা কাম—সবরকম স্পৃহা জয় করার জন্য ওদের ওই সাধনা এই রিটায়ার্ড পোস্টমাস্টার আর তার বৌ কি কল্পনাও করতে পারে? না। এরা সব সংশোধনের অতীত। আসগর একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, না, এদের সঙ্গে বকবক করে লাভ নাই। বাইরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে চোখ কুঁচকে বাবার ময়লা বেনিয়ানটা দ্যাখে এবং চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'এসব যে কি পরে থাকো? এত সব দামি স্লিপিং স্যুট এনে দিই, সেসব কবরে নিয়ে যাবে?'

সরোয়ার কবিরের ড্রয়িংরুমে তখন কেউ নাই। দারোয়ান গেট খুলে দেওয়ার সময় আরগস একটু ঘেউ ঘেউ করলেও আসগরকে চিনতে পেরে ফের শুয়ে পড়ে। এখন কমলালেবু ভেতরে পাঠায় কি করে? আসগর কয়েকবার গলা খাঁকারি দিল, আবদুলের নাম ধরে কয়েকবার ডাকল, কোনো সাড়া নাই। বেশি জোরে ডাকতেও ভয় হয়, কি জানি কারো ঘুম ভেঙে যায়। সায়েব কি রাগ করল? মাদারবাড়িতে না গেলেই হতো। মেমসায়েব না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তার প্রতিক্রিয়া কতরকম হতে পারে। যেমন খালি পেটে ভালো ঘুম হওয়া অসম্ভব। ভালো ঘুম না হাওয়া মানে হ্যাংওভার। হ্যাংওভার মানে বদমেজাজ।

বদমেজাজ হলে হাজব্যাণ্ডের ওপর একচোট ঝাড়া, তার মানে সরোয়ার কবিরেরও মেজাজ খারাপ। তাহলে আসগরের অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? ম্যাকডোনাল্ড অ্যাণ্ড রবিনসনের কাজটা সম্বন্ধে কাল একবার মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিল, তা সায়েবের মেজাজ শরীফ ঠিক না থাকলে আর কথা বলবে কি করে? ওই কোম্পানির কাজটা বাগানো এমন কিছু নয়, সরোয়ার কবির একবার কি বড়োজোর দু'বার টেলিফোন করলেই হয়ে যায়। এরা টাকাপয়সা মেলা এদিক-ওদিক করছে, চুরি করার যাবতীয় সীমা পার হয়ে গেছে, সরোয়ার কবির এদের ওপর দারুণ চটা। ওদের একজন ডিরেক্টর নানাভাবে তোয়াজ করার চেষ্টা করছে, সরোয়ার কবিরের পেছনে খুব ঘুরছে, সরোয়ার কবিরও বেশ ঘোরাচ্ছে। যতই ঘোরাবে কমিশন ততই বাড়বে। মোক্ষম সময় যাচ্ছে এখন, ইচ্ছা করলে আসগরকে এখনই কাজটা পাইয়ে দিতে পারে। সরোয়ার কবির আসগরকেই বা এভাবে নাচাচ্ছে কেন? আসগর তো তার জন্য কম করে না। মধ্যরাতে কমলালেবু জোগাড় করে আনা তো কোনো ব্যাপারই নয়, কত রিস্কি কাজ করে দিচ্ছে—তার হিসাব দেবে কে? বড়ো বড়ো ফার্ম সরোয়ার কবিরকে যে কমিশন দেয় তার মধ্যে ইন-কাইণ্ড যা আসে তার শতকরা পঁচিশ ভাগ আজকাল ট্যাক্‌ল করে আসগর। কোনো কোনো জিনিস আনতে হয় সোজা পোর্ট থেকে। এসবে খাটনি কি কম? খাটতে আসগরের আপত্তি নেই, ঝুঁকি নিতেও সে পেছপা হয় না। তা একটা ভালো চাকরি ম্যানেজ করে না দিলে কি পোষায়? কয়েক দিন খুব ঝোলালো, মস্ত কোম্পানি, আড্রিয়াটিক-বেঙ্গল বে লাইনে কনটেনার সার্ভিস, বেতন মেলা, তার ওপর আন্ডারওয়ার্লড বিজনেসের হেভি কমিশন + কুলশিতে ফার্নিশড ফ্ল্যাট। ফার্নিশড মানে খালি খাট পালং আর চেয়ার টেবিল নয়, এর ওপর রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, ইউটেনসিলস, কিচেন গ্যাজেটস, এমনকি প্রতি বছর কয়েক সেট করে বিছানার চাদর, বেড কভার, পর্দা—সব, সব। চাইলে অ্যালসেশিয়ান জোগাড় করে দেবে। কাজটায় ঝুঁকি আছে; শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কারবার স্মাগলড গুডস নিয়ে, ধরা পড়লে কোম্পানি সম্পূর্ণ প্রোটেকশন নাও দিতে পারে। তা অত সুযোগ দেবে আর সে এটুকু করতে পারবে না? কিন্তু কাজটা জুটল কোন মিনিস্টারের শালা না ভাইপোর। অথচ মন্ত্রীর আত্মীয় কি আর সরোয়ার কবিরকে এরকম সার্ভিস দেবে? একেকবার আসগরের মনে হয়, দুত্তোরি! সব ছেড়েছুড়ে চলে যাবে। কোনো ফার্মে ছোটোখাটো চাকরি সে নিজেও কি জোগাড় করে নিতে পারে না? পারে। কিন্তু তাহলে কি পাঁচলাইশ কি কুলশিতে ফার্নিশড বাড়িতে থাকা যাবে? ইহজীবনে নয়। কখনো কখনো ভাবে, পোর্টের অন্ধিসন্ধি তার যা রপ্ত হয়েছে তাতে নিজেও বেশ করে খাওয়া যায়। কিন্তু তখন আবার

ফেঁসে যাওয়ার চান্স থাকে। রিস্ক সে নিতে পারে বটে, কিন্তু মাথার ওপর কেউ না থাকলে চলে না। তাছাড়া এরকম ভাবটাও তার অন্যায়। কবির ভাই না থাকলে এত লোকজন, এত ট্রিকস, এত পথঘাট—না, কিছুই তার জানা হতো না। কবির ভাইকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতেই হবে। লেগে থাকলে কি না হয়? কাল খুব ভোরে উঠেই অ্যালসেশিয়ানটা নিয়ে আসগর খেলবে। সরোয়ার কবির সেই সময় লনে কিছুক্ষণ ফ্রি-হ্যাণ্ড এক্সারসাইস করে। তখন কি ম্যাকডোনাল্ড অ্যাণ্ড রবিনসনের কথাটা পাড়বে? না না—তা হয় না। আরগসকে আদর করে তখন সরোয়ার কবিরের ইমপ্রেশনটা জাস্ট ভালো করা। ব্যস, দিস মাচ। সায়েবকে তখন শুধু খুশি করা। কথাটা বলবে সরোয়ার কবির যখন অফিস যাবে তার আগে আগে। সবচেয়ে ভালো হতো ড্রাইভার ব্যাটাকে কুড়িটা টাকা গছিয়ে দিয়ে মেয়ের অসুখের নাম করে সকালবেলা ছুটি নেওয়াতে পারলে। তাহলে সরোয়ার কবিরকে গাড়ি ড্রাইভ করে অফিস নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় আসগর, ওইসময় ভালো করে পটানো যায়। ড্রাইভারের কাছে একটু ছোটো হতে হয় বটে, তবে ওই চাকরি পেলে এরকম কত ড্রাইভার তার পায়ের নিচে গড়াগড়ি যাবে। পরিকল্পনাটি পরিষ্কার হলে আসগরের ছটফটানি কমে, ফলে ঘুমটা নামে একেবারে ঝেঁপে।

'আরগস! আরগস! নটি বয়।' ডাক শুনে আসগর লাফিয়ে উঠে দেখে, পৌনে সাতটা বেজে গেছে। জগিং শেষ করে, ফ্রি-হ্যাণ্ড এক্সারসাইস সেরে লনে আরগসের সঙ্গে বল নিয়ে লোফালুফি করছে সরোয়ার কবির। ইস! আসগরের সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। কি আর করে, হাত কচলাতে কচলাতে সে লনে এসে দাঁড়ায়। হাতের কাজ অব্যাহত রেখে সে বলে, 'কাল বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল, চকবাজার গেলাম, তো দেখি একটা দোকানও খোলা নেই, রিয়াজউদ্দিন বাজারে কেউ দোকান খুলতে চায় না। মহাবিপদ! কমলালেবু কোথায় পাই? ওদিকে নিউ মার্কেটে—' 'কমলালেবু?' এই প্রশ্নবোধক শব্দটি উচ্চারণ করে সরোয়ার কবির ফের মনোযোগ দেয় আরগসের দিকে। কিন্তু আসগরকে দেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরগস চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বারবার কেবল তার দিকেই তাকায়। 'আরগস মনে হয় তোমাকেই লাইক করে।' সরোয়ার কবির এই কথা বললে আসগরের ভালো লাগে। খুব ভালো খবর, কিন্তু কমলালেবুর ব্যাপারটা তো স্পষ্ট করা যাচ্ছে না। তার এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত সাহস—সরোয়ার কবির কি কিছুই জানবে না? কমলালেবু না পেয়ে মিসেস জেসমিন বি কবির—বুড়োধাড়ি মাগিটা অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে—সেই ক্ষোভটিও তো সরোয়ার কবির প্রকাশ করতে পারে! কিংবা কমলালেবু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ফিগারের

ব্যালান্স নষ্ট হওয়ার মস্ত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তাকে আপেল খেতে হয়েছে—এটা জানতে পারলেও আসগরের টেনশন একটা আকার পায়। এইসব সন্ত্রান্ত, মহামার্জিত ও ক্ষমতাবান লোকদের নিয়ে আসগরের হয়েছে শতেক জ্বালা। এখন চাকরির কথাটা তোলে কি করে?

সরোয়ার কবির বলে, 'আরগসের মিলটা বাড়াতে হবে, কেমন ডাল হয়ে যাচ্ছে, দেখেছো? খুব উইক।' 'জী। আবদুলকে বলে দেবো, দুধটা বরং বাড়িয়ে দিক।' আসগর জিভ নাড়ে বটে, কিন্তু আরগসের খাবার বাড়িয়ে দেওয়া অত সোজা নয়। পরশু এই নিয়ে জেসমিনের সঙ্গে সরোয়ার কবিরের একটু তর্ক মতোনও হয়ে গেল। আরগসের খাবার বাড়িয়ে দেওয়া দরকার সরোয়ার কবির এই কথা বলতেই জেসমিন প্রতিবাদ করে, 'বডি স্লিম না হলে অ্যালসেশিয়ানের সঙ্গে দেশী কুকুরের আর পার্থক্য কি? বেশি খেলেই খালি বসে বসে হাই তুলবে।'

'দিস ইজ আ সিলি আইডিয়া। শোনো, খাবার কষ্ট দিলে কোনো প্রাণীরই শক্তি বাড়ে না।'

'না, তোমাকে বলল কে? মডার্ন মেডিক্যাল সায়েন্স বলে, কক্ষনো পেট ভরে খাওয়া উচিত না, পেট ভরে খাওয়া মানেই হাঁসফাঁস করা, কোনো কাজে মন দিতে না পারা।'

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্ত্রীর ব্যুৎপত্তি নস্যাৎ করার জন্য সরোয়ার কবির হাসে, 'বাজে কথা। ব্যালান্সড ডায়েট মানে কি কম খাওয়া? যা দরকার তা তো খেতেই হবে। তবে বাউয়েলস ক্লিয়ার হওয়া চাই। লোডিং আর আনলোডিং সমান গুরুত্ব পাবে।'

'রাস্টিক।' কথায় কথায় কোষ্ঠ নিয়ে কথা তোলা জেসমিন কবিরের রুচিতে বাধে। কিন্তু সরোয়ার কবিরের প্রধান বিবেচনা আবার এটাই। সকালবেলা কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সে অবিরাম সিগ্রেট টানে, এমনকি তার ভোরবেলার জগিং ও ব্যায়ামের অন্যতম উদ্দেশ্য তার পাকস্থলি পরিষ্কার করা। একদিন লনে বসে এক বন্ধুর সঙ্গে সরোয়ার কবির এই নিয়ে আলাপ করছিল, আসগর শুনে ফেলেছে। সরোয়ার কবির বলছিল, 'সকালবেলা জগিং করতে না পারলে পেটের মধ্যে ট্রাফিক জাম, সারাটা দিন মাটি। এ্যাট এনি কস্ট আই মাস্ট গেট মাই স্টমাক ক্লিয়ার বাই সেভ্‌ন থার্টি ইন দ্য মর্নিং।'

'বৃষ্টি-টিষ্টি হলে জগিং করো কি করে? প্রবলেম হয় না?' বন্ধুর এই উদ্বেগে সরোয়ার কবির কৃতজ্ঞতার হাসি ছাড়ে, তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলে, 'সে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে।'

'কি রকম?' বন্ধুর কৌতূলহকে জিইয়ে রেখে সরোয়ার কবির ধীরেসুস্থে

সিগ্রেট ধরায়। কৌতূহল মেটাবার জন্য আসগরকেও গেটের কপাট অকারণে বন্ধ করতে হয়, ওখানে থাকার জন্যে তার ছুতো তো চাই।

'ঘুম ভাঙলে বিছানায় শুয়ে শর্ট একটা ইন্টারকোর্স সলভ্‌স ইত্তর প্রবলেম। কয়েকটা স্ট্রোক দিলেই তলপেটে চাপ পড়বে, এরপর রেগুলার ডোজ অফ থ্রি সিগারেটস অ্যাণ্ড ইউ গেট ইওর বাউয়েলস ক্লিয়ার।'

'তা সাত সকালে তোমার ওয়াইফ অ্যালাউ করবে কেন?' বন্ধু হেসেই অস্থির, 'তুমি না বলো শি ইজ আ লেট রাইজার।'

'শি ইজ।' সরোয়ার কবির ঠোঁট টিপে হাসে, এই হাসিও এরকম ভাঁটেফাঁটে না থাকলে ঠিক রপ্ত করা যায় না। ওই হাসিই প্রসারিত করে বলে, 'একটু ট্রিক খাটাতে হয়। ভোরবেলা ঘুম থেকে না উঠেও যে এক্সারসাইস করতে পাচ্ছো এতেও তোমার ফিগার স্লিম থাকবে। এক নম্বর সাঁতার আর দুই নম্বর সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইন দি আর্লি মর্নিং—আইদার অফ দীজ টু কিপ ইওর ফিগার স্লিম। —ব্যস, এই থিওরিতে কাজ হয়।'

এই পশ ধরনের হিউমার আসগর যে কবে করতে পারবে এই ভেবে এখন সে একটু উতলা হলো। তো সেদিন তো 'রাস্টিক' বলে জেসমিন কবির ভেতরে চলে গিয়েছিল, আজ স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্যের কথা মনে করে আসগর বলল, 'বেশি খাওয়ালে আপা আবার রাগ করতে পারে।'

'তোমার আপার কথা বাদ দাও। ওর মিল বাড়াতেই হবে। একটু ছোটাছুটি করলেই খাবারটা হজম হবে, এজিলিটি বাড়বে। অ্যালসেশিয়ানস আর অলওয়েজ নিম্বল-ফুটেড। মাই আরগস ইজ রাদার স্লো। ওর প্রপার নিউট্রিশন হচ্ছে না।'

আসগর বলে, 'আজ ওর খাবার সময় আমি দেখব।'

'একটু দেখো তো। কুকুরের যত্ন নিলে মানুষ ছোটো হয়ে যায় না।'

'না না, তা কেন?'

'কুকুরের মতো বন্ধু কি হয়? আমি কয়েকদিন বাইরে কাটিয়ে এলে আরগস কিভাবে রি-এ্যাক্ট করে দেখো না? যতবার বাইরে থেকে এসে ওর জুভিল্যান্ট মুড দেখি ততবার আমার মনে হয় ওর নাম রাখাটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়েছে।'

সরোয়ার কবির লনে চেয়ারে বসে একটু একটু পা দোলায়, আরগস শুয়ে শুয়ে সামনের ডান পা দিয়ে মাছি ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে। রোদ ছড়িয়ে পড়ছে লনে, রোদের সীমানা মিনিটে মিনিটে বাড়ে। কচি রোদের আলোয় শিশিরভেজা সবুজ ঘাসে মোড়ানো ঢিলাগুলো ঝকঝক করে। আসগর এই পরিবেশের সুযোগ নিতে চায়, 'এহসানুল হক সায়েবকে আমার কথা বলেছিলেন?'

'ম্যাকডোনাল্ড রবিনসনের হক? ওদের থাকতে দিই কিনা দেখো! ব্যাটারা কোটি কোটি টাকার বিজনেস করবে আর গভমেন্টকে ট্যাক্স দেওয়ার কথা

তুললেই ধানাইপানাই। কি করে বিজনেস করে আমি দেখব।' সে ফের আরগসের প্রসঙ্গে ফিরে আসে, 'এরকম হয়েছিল অডিসিতে। অডিসিউস যখন ইথাকায় ফিরে আসে—'একটু থেমে বলে, 'অডিসির নাম শোনোনি?'

নামটা আসগরের চেনা চেনা ঠেকে, কোন জাহাজের বিজ্ঞাপনে দেখেছে, সাহস করে বলে, 'কোনো শিপের নাম বোধহয়, না? অ্যামেরিকান লাইনার?'

'শীপ! শীপ! শীপ! তুমি একটা আস্ত শীপ, বুঝলে? এস এইচ ডবল ই পি। অডিসির নাম শোনোনি, বি. এ পাস করেছো কিভাবে?' বিরক্ত হয়ে সরোয়ার কবির চুপ করে। আসগর কি আর বলবে, বি. এ যে কিভাবে পাস করেছে সে বিবরণ না দেওয়াই ভালো।

'এই যে, সকালবেলা উঠেই মাস্টারি শুরু করেছো?'—বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলে জেসমিন কবির, 'সুযোগ পেলেই মাস্টারি।'

'আরে তোমার ঘুম ভেঙে গেছে? সো আর্লি?'

'যে লেকচার শুরু করেছো, এর মধ্যে ঘুমুই কি করে? ইস! এত মাস্টারি করতে পারো।'

মাস্টারির কথায় কাজ হয়। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে সরোয়ার কবির সেই প্রথম যৌবনে বছরখানেক কোনো কলেজে ইংরেজি পড়িয়েছিল, তারপর সি. এস. এস পরীক্ষা দিয়ে চাকরি নিল, তারও বছর-দুয়েক পর বিয়ে করল। কোনো বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে কথা বললেই সেই কবেকার মাস্টারির কথা তুলে জেসমিন এমন তীক্ষ্ণ গলায় ঠাট্টা করে সে সরোয়ার কবিরকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষান্ত দিতে হয়। মহিলা আসায় আসগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কৃতজ্ঞতায় সে জিভ নাড়ে, 'আপা, কাল আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কমলালেবু আনতে আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তো অত রাত্রে দোকানপাট তো সব—'

'ও মা, কমলালেবু এনেছিলে?' জেসমিন কবির কলকল করে ওঠে, স্বামীর দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'আর তুমি আমাকে একগাদা আপেল খাইয়ে দিলে, এ্যাঁ?'

'তোমার ঘুম পাচ্ছিল, তাই এক স্লাইস আপেল খেতে বললাম।'

'তা একটু ওয়েট করলেই তো পাওয়া যেত। তুমি কখন এসেছো আসগর?'

সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে আসগর ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'দুটো-আড়াইটে বেজে গিয়েছিল। অত রাত্রে কোথাও দোকান খোলা নেই, চকবাজারে সব বন্ধ, চকবাজার থেকে রিয়াজউদ্দিন মার্কেট—সব বন্ধ। আগ্রাবাদে কর্ণফুলী মার্কেটেও দোকান খোলা নেই। কি আর করি, শেষ পর্যন্ত ফের রিয়াজউদ্দিন মার্কেটে—'

কিন্তু তার এই কর্মতৎপরতায় জেসমিন কবিরের কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। তার টার্গেট এখন সরোয়ার কবির, 'টেল মি সরোয়ার, আমার

ওয়েট বাড়লে কি ফিগারটা বেঢপ হয়ে হাউ ডাজ ইট হেল্প ইউ?' স্ত্রীর এই মারাত্মক অভিযোগে সরোয়ার কবির বিচলিত না হয়ে খাদ্য পরিপাক ও কোষ্ঠ পরিষ্কার সম্বন্ধে তার বক্তব্য ঝাড়ে, 'আমি বলি যদি ডাইজেস্ট করতে পারো তো যতই খাও না বডি ঠিক থাকে। নিয়মিত এক্সারসাইস করো, জাস্ট ফ্রি-হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ, আর বাউয়েলস ক্লিয়ার হলে—।'

'ননসেন্স!'

জেসমিন কবির উঠে ভেতরে চলে গেলে সরোয়ার কবির বেশ জড়সড় হয়ে পড়ে। তখন উঠে বৌয়ের পিছে পিছে গেলে এক ধরনের আত্মসমর্পণ হয়, আসগরের সামনে ব্যাপারটা ঠিক হবে না। অথচ এখন যাওয়াটা তার খুবই জরুরি। এতক্ষণ দুটো সিগ্রেট শেষ করেছে, তিন নম্বরটি ব্যবহার করবে টয়লেটে ঢুকে। ঠিক সময় মতো ঢুকতে না পারলে স্টমাক ক্লিয়ার হবে না। তাহলে দিনটা মাটি। সরোয়ার কবিরের মুড অফ হলে আসগরের কথাটা পাড়বে কি করে? সরোয়ার কবিরকে সহজ করে তোলার জন্য আসগর উদ্যোগ নেয়, 'আমার মনে হয় আরগসের বাউয়েলস ক্লিয়ার হচ্ছে না।'

'একটু দেখলেই তো পারো।' তেতো গলায় বলে সরোয়ার কবির ভেতরে চলে যায়। তার দামি সিগ্রেটের প্যাকেট পড়ে থাকে টিপয়ের ওপর। প্যাকেটটা প্যান্টের পকেটে রাখতে গেলে আসগরের পকেট থেকে তা বেরিয়ে থাকে। এই সিগ্রেট আজকাল সুযোগ পেলেই আসগর প্যাকেট থেকে দু-একটা করে সরায়। এখন প্রায় ভরা প্যাকেট সরাতে গিয়ে তার দারুণ উত্তেজনা হয়। এর মানে কি? পোর্ট থেকে একবার গাড়িতে মস্ত টেপরেকর্ডার নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় কাস্টমসের সেপাই তার গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল একেবারে ল্যাম্পোস্টের নিচে, তখনো বুক এভাবে কাঁপেনি। আস্তে করে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল এমন কায়দায় যাতে আলো পড়ে তার মুখে, পেছনের সিটে ছায়া পড়ায় মালটা দেখা যাচ্ছিল না। আর ওই সেপাই ব্যাটার চোখের মণিতে এমনভাবে তাকিয়েছিল যে লোকটা বাঁকাচোরা হয়ে অ্যাটেনশন হয়ে তাকে স্যালুট দিয়ে ফেলেছিল। মাথা বেশ ঠাণ্ডা রাখা সেই সময় চাট্টিখানি কথা নয়। তাহলে এখন এরকম হচ্ছে কেন?

অফিসে যাওয়ার সময় সায়েবের মুড অনেক ভালো, বেশ ভালো। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'আসগর, ম্যাকডোনাল্ডের এহসানুল হক টেলিফোন করেছিল, বিকালে আসবে, তুমি থেকো।' নরম আওয়াজে তার গাড়ি চলে যায় আগ্রাবাদের দিকে। একটা লিফট পেলে আসগরের ভালো হতো। বাসায় মিস্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে সে নিজেই চলে যেত সিমেন্টের খোঁজে। দোকানদারদের সঙ্গে বাবা দামটাম নিয়ে বিশ্রী রকম খ্যাচাখেচি করে। লাভ কিছুই হয় না, ব্যাগ প্রতি

দু-এক টাকা কম দিয়ে ভেজাল মেশানো মাল গছিয়ে দেয়। আসগরের খিদেও পেয়েছে অসম্ভব রকম। এদের ব্যাপার বোঝা দায়, যেদিন মুড ভালো তো গাদা গাদা খাওয়ায়। আবার দেখো কাল বিকাল থেকে এ-পর্যন্ত কয়েক ফোঁটা হুইস্কি আর কমলালেবুর গোটা চারেক কোয়া ছাড়া পেটে কিছুই পড়েনি। রাত্রে মা এত করে মাছ দিয়ে ভাত খেতে বলল! মা দিন-দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে, ভেতরে ভেতরে কি রোগ হচ্ছে কে জানে? ম্যাকডোনাল্ড অ্যাণ্ড রবিনসনের কাজটা পেলে খেয়ে না খেয়ে দিনরাত এখানে পড়ে থাকতে হবে না! কোম্পানির ভালো বাড়ি আছে কুলশিতে। ফার্নিশড বাড়ি, যা যা দরকার সব পাওয়া যাবে। এমনকি ফর্সা, বয়-কাট চুল, ডায়াটিং-করা, স্লিম, ন্যাকা ন্যাকা করে কথা-কওয়া একটা বৌ পর্যন্ত। প্রবলেম বাবা-মাকে নিয়ে, ওই দুজনকে নিয়ে মুশকিল। বাবাকে এত করে বলে, জামাকাপড়গুলো একটু ভালো দেখে পরো, তোমাকে তো আর পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে না, আমি রেগুলার সাপ্লাই দিয়েই যাচ্ছি। না, তার কেরানি মেন্টালিটি ঘোচাবে কে? আর মায়ের খাওয়ার রুচি ইমপ্রুভ করা তার সাধ্যের বাইরে। এরা সব ইনকরিজেবল। কিন্তু আসগরকে তো থাকতে হবে তার নিজের মতো করে। ঠিক আছে—তোমরা নিজেদের নিয়মে থাকো, টাকাপয়সা যখন যা লাগে দেব। টাকাপয়সা কি জিনিসপত্র নেওয়ার বেলায় তো বাছাধনদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই, আসগর যেখান থেকে যা-ই নিয়ে আসে চুপচাপ ঘরে ঢোকায়, জিগ্‌গেসও করে না, এটা কোথায় পেলি বাবা? তাহলে তার মতো করে চলবে না কেন? হঠাৎ করে এতটা রাগ হয় তার যে আরগসকে চড় মারার জন্য বাম হাতটা ওপরে উঠে যায়। পাগল! সে কি পাগল হয়ে গেল? বুদ্ধিমানের মতো চট করে ডান হাত দিয়ে নিজের বাম হাতটা নামিয়ে নেয়। ডান হাতের চাপে বাম হাতের কবজি লাল হয়ে গেল।

বিকালে আসগর একটু ফিটফাট হয়ে আসে, এহসানুল হককে ইম্প্রেস করা চাই। তবে সব নির্ভর করে সরোয়ার কবিরের ওপর। আসগর যখন ঢোকে আরগসকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আবদুল। এটা হলো আরগসের বেড়াবার সময়। এক ঘণ্টার বেশি তাকে বাইরে রাখা যাবে না, সায়েব ফিরে এসে বারান্দায় তাকে ল্যাজ-নাড়া অবস্থায় দেখতে ভালোবাসে।

আসগর বলে, 'আবদুল, আমার কাছে দাও।'

'ক্যান?'

'দাও না, একটা নতুন খেলা শেখাব।'

'এখন তো অর বেড়াইবার টাইম। সায়েবে অর লগে খেলে অফিস থিকা আইসা।'

'সায়েব ফেরার আগেই আমি নিয়ে আসব।'

আবদুল ইতস্তত করে, 'এই সময় ওই যে ওই বাড়িগুলির ওইদিকে ইঁটের পাঁজা, তার পারে ঝোপের মধ্যে বাহ্যি করব। আপনে না হয় সকালবেলা খেলা শিখাইয়েন।'

'যা বলছি শোনো। সবই করব।'

কিছুক্ষণের জন্য ডিউটি থেকে রেহাই পাবার ইচ্ছাও আবদুলের কম নয়। শিকলটা আসগরের হাতে সমর্পণ করে সে বলে, 'এট্টু টাইট কইরা ধইরেন। কুত্তাটা খালি ছুইটা যাইতে চায়।'

বাইরে পা দিতে না দিতে আরগস সত্যিই ছুটে যেতে চাইছে। ইঁটের পাঁজার কাছে পৌঁছতেই ওর স্পিড দ্বিগুণ হয়ে গেল। শিকলে কেবলই টান পড়ে। তা আসগর ধরেছেও টাইট করে, বাপধন যাবে কোথায়? এই শিকল ছেঁড়া তোমার বাপেরও সাধ্যি নয়। ওর বাপটা ছিল কে? সরোয়ার কবিরকে জিগ্‌গেস করতে হবে। লোকটা জানে না হেন বস্তু নাই। ইঞ্জিনিয়রদের সে সিমেন্ট-বালির অনুপাত সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, অ্যান্টি-বায়োটিক কোথায় প্রয়োগ করা উচিত তা শিখিয়ে দেয় ডাক্তারদের, কলেজের বুড়ো প্রফেসর দেখা করতে এলে তাকে প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ক্লাসে রোলকল করার সঠিক ও আধুনিক পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়েছিল। ঝাড়ুদারকে ঝাড়ু ধরার কায়দা দেখিয়ে দেয়, আইন গাইনের যথাযথ উচ্চারণ সম্বন্ধে তার এলেম জবরদস্ত আলেমদের স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মেয়েদের পটাবার বিদ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত লম্পটদের সে হার মানাতে পারে, কুকুর কখন কি খেতে ভালোবাসে সংশ্লিষ্ট কুকুরদের চেয়ে সে ভালো জানে। আরগস কি এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানে যে সে হলো নেকড়ের বংশধর? কিন্তু সরোয়ার কবির জানে। এ নিয়ে আসগরের কাছে সে কতদিন কত পাঠ দিয়েছে। লোকটা এত শিখল কোত্থেকে? লাহোর সিভিল সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে কত ট্রেনিং দেয়, সেখানে—নাকি প্রশাসনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে? এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়ার আগেই শিকলে হ্যাঁচকা টান পড়লে আসগর প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোনোমতে সামলে নিল। এখন বুঝতে পাচ্ছে, আরগসের বাউয়েলস আসলে ক্লিয়ার হচ্ছে না। সরোয়ার কবির ঠিকই বলে যে পাকস্থলী পরিষ্কার না হলে জীব শান্তি পায় না। আসলে ক্লিয়ার করার বন্দোবস্ত করাটা খুব দরকার। সায়েবসুবোর বাড়িতে থাকে, ওদের নিয়ম মানলেই কাজ হবে। পকেট থেকে সকালবেলা সরোয়ার কবিরের টেবিল থেকে হাতানো সিগ্রেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরালো। সিগ্রেট শেষ করার পরও আসগরের হাতের মুঠিতে শিকলের কম্পন বোঝা যায়! এই সময় আরগসের উত্তেজনা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে এই ভয় করতেই শিকলে বেশ জোরে টান পড়ে। এবার ঠিক হ্যাঁচকা টান নয়। বেশ লম্বা ধরনের শক্ত টান। না, অত ঝুঁকি নেওয়া যায় না। আসগর

তাকে ডান হাতের কবজিতে শিকলের এদিকের প্রান্ত বেশ টাইট করে জড়িয়ে নিল। একরকম বাঁধাই হয়ে গেল আর কি! এবার সম্পূর্ণ নিরাপদ, এখন শালা কুত্তার বাচ্চা যদি ছোটে তো তাকে না নিয়ে যেতে পারবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে দ্বিতীয় সিগ্রেটটি ধরিয়ে গোটা-তিনেক লম্বা টান দেওয়ার পর আসগরের হাতের শিকল শান্ত ও শিথিল হয়ে আসে। আসগর সিগ্রেটে বেশ কয়েকটা সুখটান দেয় আর অনুভব করে যে আরগস খুব আরাম ও তৃপ্তির সঙ্গে বাউয়েলস ক্লিয়ার করছে। শিকলের ধাতব বিনুনি বেয়ে সেই তৃপ্তি আসগরের শরীরে চমৎকার মৌতাত ছড়িয়ে দিচ্ছে। অফিস থেকে ফিরে সরোয়ার বি কবির দেখবে তার প্রিয় প্রাণীটি কত সপ্রতিভ হয়েছে, নিম্বল-ফুটেড অ্যালসেশিয়ানের স্পিড লক্ষ করে সে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। এ ব্যাপারে তার নিজের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের কথা আসগর কিভাবে প্রকাশ করবে এ নিয়ে আগেই কিছু ডায়ালগ ঠিক করে রাখা দরকার। এটা পরে করলেও চলবে। এখন রেগুলার ডোজ হিসাবে তিনটে সিগ্রেট খাওয়া উচিত, তিন নম্বর সিগ্রেটটি ধরাতেই আসগরের হাতে শিকল শিরশির করে ওঠে এবং সে রিনিঝিনি আওয়াজ শুনতে পায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার, আশাতিরিক্ত ক্ষিপ্রতায় আরগস তার সামনে এসে মৃদু মৃদু ল্যাজ নাড়ে। কোনো সন্দেহ নাই যে তার পাকস্থলীতে এখন শেষ-শীতের নির্মল হাওয়া বইছে। হাওয়ার তোড়ে সে এতটা বেগে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করে যে আসগরকে রীতিমতো দৌড়াতে হয়। তাড়াতাড়ি যেতে হবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সরোয়ার কবির ঘরে ফিরবে।

১৯৮৭

মহাকালের খাঁড়া

কায়েস আহমেদ

ভরত কোলে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে।

খবরটা অবশ্য শুনছে বেশ কিছুদিন ধরেই। প্রথম প্রথম খবরের কাগজে, তারপর হোটেল বাজারে রেলে বাসে।

আলের ধারে ফ্ল্যাগ পুঁতে ধান কেটে নিয়ে যাওয়া, রাস্তার ধারে গলা কেটে ফেলে রাখা, পুলিশের সঙ্গে পাইপগান নিয়ে সামনাসামনি লড়াই—এ-সবই শোনা কথা, খবরের কাগজে পড়া খবর। বর্ধমানের সা' বাড়ির ঘটনাটা তো রীতিমতো হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এমন করে তার দোরগোড়ায় এসে যাবে ভাবতে পারেনি।

মাসখানেক আগে গরলগাছায় রাস্তার ধারে এক বাড়ির গায়ে আলকাতরা দিয়ে বড়ো বড়ো হরফে লেখা : 'শ্রেণীশত্রু খতম চলছে চলবে' দেখে ভরতের বুকের ভেতর কলজে লাফিয়ে উঠেছিল, তার বাড়ির চার মাইলের মধ্যে এমন ছোরা-ওঁচানো ব্যাপার চলে এসেছে, আর সে কিনা দূরের ঘটনা, খবরের কাগজের খবর মনে করে দিব্যি সুখে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ভেতরে ভেতরে সিঁটিয়ে যায় ভরত, আশপাশের লোকজনের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারে না, কী জানি কার ভেতর কি আছে!

বাড়িতে ফিরেও স্বস্তি পায়নি, স্টেশনে গিয়ে ছেলেকে আড়ালে ডেকে খুব গম্ভীর মুখে সাবধান করে দিয়েছিল : 'খবরদার, কোনো ঝুট-ঝামেলায় যাবি না, খদ্দেরের সঙ্গে রাগ-ঝাল করবি না, আর আড্ডা বসাবি না দোকানে, রাজনীতি-ফাজনীতির আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করবি না।'

সুরেন মাথা হেঁট করে বাপের কথাগুলো শোনে। এতগুলো 'না' চব্বিশ বছরের জোয়ান তাগড়া ছেলেটা কিভাবে নিচ্ছে বুঝতে পারে না ভরত, ছেলের মাথা নিচু করা মোটা টানটান ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে ভারি অস্থির হতে থাকে সে। জোয়ান ছেলের বাপ হওয়া যে কী বিড়ম্বনার!

ইলেভেন ক্লাস পর্যন্ত পড়ে পড়াশোনা ছেড়েছুড়ে দিয়ে ছেলেটা ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা আর যাত্রা-থিয়েটার করে বেড়াচ্ছিল। একমাত্র ছেলে, তার ওপর মা'র আদুরে গোপাল, ভরত আর কী করতে পারে! সে তার

নিজের শতেক ঝামেলা নিয়েই ঝালাপালা। একলা মানুষ ক'দিকে সামলাবে! আর মাথা-ঝাড়া দেওয়া উচিত বয়েসের ছেলেকে চোখে চোখে রাখা ভরতের কম্মো নয়।

গোপী দত্ত এসে কেঁদে পড়ল একদিন! 'ভরত—আমার মান বাঁচা!' খোঁজখবর নিয়ে ভরত সব বুঝল, ছেলেকে কিছু বলল না, উত্তরপাড়ায় ডাক্তারের ক্লিনিক থেকে গোপী দত্তকে দিয়ে তার মেয়েকে শুদ্ধ করে আনল। সমস্ত খরচ দিল ভরত। ছেলেকে রেডিও মেকানিজমে ভর্তি করে দিল। ছেলে বুঝল সবই, মাথা হেঁট করে বাপের ব্যবস্থা মেনে নিয়ে রেডিও মেকানিজম শিখতে গেল।

বেগমপুর স্টেশনে ছেলেকে রেডিও ট্রানজিস্টার মেরামতের দোকান করে দিয়েছে ভরত। সুরেন ঘাড় গুঁজে ট্রানজিস্টার মেরামত করে। ব্যাবসা সে বেশ ভালোই জমিয়েছে। গত বছর ভরত বিয়ে দিয়েছে ছেলের, গোপী দত্তর মেয়ের সঙ্গে নয়, জয়কেষ্টপুরের হারু ঘোষ তার ছেলের শ্বশুর।

তবু ভয় যায় না ভরতের, জোয়ান বয়েসটাকে ভয়, তাগড়াই শরীরটার ভেতরে যে গরম রক্ত, তাকে ভয়, মুখের টানটান রেখাগুলোকে বড়ো ভয় পায় ভরত। গোপী দত্তর মেয়ের ব্যাপারটা ভুলতে পারে না সে।

—'বুড়ো বয়েসে আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দে বাবা!' ভরত ভেতরে ভেতরে নুয়ে পড়ে একেবারে।

—'আহ্ বাবা, আমাকে নিয়ে তোমার এত ভয়?'

গোপী দত্তর মেয়ের কথা ভরতের মাথায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে, তবু সে বড়ো অসহায় কণ্ঠে বলে, 'ছেলের বাবা হ, তখন বুঝবি বাপ হওয়া কি!'

ভরতের চোলাই মদের কারবার। শোনকা, বারুইপাড়া, বাকসা, মণিরামপুর আদান, জনাই, বেগমপুর, চণ্ডিতলা, গরলগাছা, হাটপুকুর, কুমিরমাড়া জুড়ে তার এই গোপন কারবার আজ কুড়ি বছর ধরে চলে আসছে। এই কুড়ি বছরে হ্যাপা তাকে কম পোয়াতে হয়নি। পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, সমাজ-তন্ত্রওলারা পিটিয়েছে।

কিন্তু ভরতকে দমাতে পারেনি। কারবার তার ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়েছে দিনে দিনে। আগে আন্তানের মদন সাহা আর সে ছিল চণ্ডিতলা থানার ভেতর একচেটিয়া। ছুটকো-ছাটকা দু-একজন যে ছিল না তা নয়, তবু তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

কিন্তু এই পাঁচ-সাত বছরে যা হয়েছে, ভাবা যায় না, সাত-আট মাইলের মধ্যে এমন গ্রাম খুব কমই আছে যেখানে দু-চারটে গোপন ভাঁটি নেই।

এতেও ভরত ঘাবড়ায়নি। বেগমপুরের পটলার সঙ্গে মিলে সে নতুন ব্যাবসা ফেঁদেছে।

কাজ এমন কিছু নয়, মানুষ এসে জিনিস দিয়ে যাবে, সেই জিনিস জায়গা মতো পৌঁছে দিতে পারলেই করকরে নোটের তাড়া।

ঝুঁকি অবশ্য বড্ডো বেশি। তা ঝুঁকি নেই কিসে? তার মদের কারবারে ঝুঁকি নেই?

ভরত বলেছে : 'আমি রাজি, পটলা তুই লাইন কর।' পটলা লাইন করেছে রেলের ওয়াগন-ভাঙা দলটার সঙ্গে।

ঠাকুরের কৃপায় ধরা ভরত এ পর্যন্ত পড়েনি। মদের কারবারও বন্ধ করেনি। লোকদেখানো গমকলটাও ঠিক রেখেছে তাজপুর বাজারে। জমি কিনেছে এস্তার। দখিনজলা, কোচের জলা, কাঁকড়াকুলের জলা। চারটে পেল্লায় গোলা ভরা টাবুটুবু ধান। বাঁশ বাগান, ফল-পাকুড়ের বাগান। পাঁচ-পাঁচটা পুকুর লীজ নিয়ে মাছের চাষ করছে। শ্রীরামপুর-চণ্ডিতলা রুটে বাস চালু হতে ঝোঁক চেপেছিল, বাস কিনবে।

সুরেনের মা বারণ করেছে, 'কি হবে, কমতিটা কিসে তোমার। ঠাকুরের ইচ্ছায় লক্ষ্মী বাঁধা পড়েচে তোমার ঘরে—একটা ছেলে, ভগবান বাঁচিয়ে রাখলে ফেলে-ঝেলে খেলেও ফুরোবে না। বাস কেনা ঝামেলা বৈ তো নয়।'

তা ঠিক, কমতিটা কি তার!

তিনতলা বাড়ি, সামনে সান-বাঁধানো পুকুর, গোয়ালে গরু, চাকরবাকর, আশ্রিত-পুষ্যি, ঝি-দাসী নিয়ে তার ভরভরন্ত সংসার।

কী থেকে কিসে এসে দাঁড়িয়েছে। ছিল দু' কামরা মাটির ঘর। খোড়ো চাল। শ্রীরামপুরে জুতোর দোকানে মাস মাইনে চাকরি করত। আকালের বছর বাপ মারা গেল। ভগীরথ সাহার কাছে ঋণ করেছিল বাপ। চক্রবৃদ্ধি সুদের সেই দেনা শোধ করতে গিয়ে মালিকের চোখ ফাঁকি দিয়ে তার মালই হাত সাফাই করেছে।

আনোখীলাল বলেছে, 'ভরতবাবু, গরিবের আবার পাপ কি! গরিব হওয়াটাই পাপ।'

আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলেছে, 'উ সালা যো ভগোয়ান মাথার উপরে বইসিয়ে রইয়েছে, উ সালা ভি বোঢ়ো লোকের দলে।'

আনোখীলালের সঙ্গে গোপন কারবার করে বাপের ঋণ শোধ করেছে, কিন্তু নিজে রক্ষা পেল না—মালিক ধরে ফেলল তাকে। জেলেই যেতে হতো, অনেক কষ্টে জেলের হাত থেকে রক্ষা পেল বটে, কিন্তু চাকরিটা গেল। শ্রীরামপুর ছাড়তে হলো। তা ভালোই হলো শ্রীরামপুর ছেড়ে। যুদ্ধের বাজার তখন। সুতোর বড়ো টানাটানি। গুড়ুপ, বর্ধমান থেকে গোপনে সুতো পাচার চলছে। গ্রামে ফিরে ভরত ভিড়ে গেল তাদের সঙ্গে। সেই থেকে শুরু।

কখন চুলে পাক ধরল, কখন মাথায় টাক পড়ল—পঞ্চাশটা বছর পার করে দিল ভরত, নিজের দিকে ফিরেও তাকায়নি।

নিজের মদের কারবার। মদ বিক্রি করে হাজারো লোককে মাতাল করে, নিজে মাতাল হয়নি কোনোদিন। মদ ভরত স্পর্শ করেনি কখনো। মেয়েমানুষের নেশাও নেই তার। নেশার কথাই যদি বলো, তাহলে মানুষের সবচেয়ে বড়ো নেশাটাই আছে ভরতের—টাকা করা, সম্পত্তি করা। পরিশ্রম করে, ফন্দি-ফিকির করে, কৌশল করে ভরত টাকা করেছে, সম্পত্তি করেছে।

সেই টাকা আর সম্পত্তি এখন শতমুখী রাক্ষস হয়ে তাকে গিলতে আসছে, একমাত্র ছেলেও তার বুকের কাঁটা।

চলা-ফেরায় ভরত বড়ো সতর্ক এখন। রাতের বেলা সদর দরোজা বন্ধ হয়েছে কিনা নিজে এসে পরখ করে যায়, ওপরের তলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে কোলাপসিবল গেট বসিয়েছে—তবু রাতে ঘুম হয় না ভরতের।

স্ত্রী বলে, 'তুমি পাগল হয়ে যাবে এবার।' ভরত ক্ষেপে যায়, 'তোমাদের কি, ঘরে বসে বসে খাও আর ঘুমোও, দিনকালের খবর তোমরা কি বুঝবে।'

ছেলেকে সাবধান করেও স্বস্তি পায়নি ভরত। পুত্রবধূকে সাবধান করেছে, সে যেন স্বামীকে আগলে রাখে। অল্পবয়সী নতুন বউ তাতে আরো ঘাবড়ে যায়। রাতের বেলা স্বামীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'তুমি আরো সকাল সকাল আসতে পারো না, আমার খুব ভয় লাগে।'

সুরেনের অসহ্য মনে হয়—কী আরম্ভ করেছে মানুষটা, বুড়ো হলে কি ভীমরতি ধরে! একটা মানুষ এতগুলো লোককে পাগল করে তুলেছে!

কারা যে এইসব লিখছে কিছুতেই বুঝতে পারে না ভরত। এই এক মাসের মধ্যে তার চারপাশের দেওয়াল ভরে গেল। ভরত এখন মানুষের মুখ লক্ষ্য করে, মানুষের কথা লক্ষ্য করে, জটলা দেখলে তটস্থ হয়ে যায়।

পটলা বলে, 'দিনকাল বড়ো খারাপ পড়েছে ভরতদা, এই যে তোমার সঙ্গে আজ কথা বলছি, কাল যে তোমাকে আবার দেখতে পাব তার কোনো গ্যারান্টি নেই—কি আমাকেই যে তুমি দেখতে পাবে তা-ই বা জোর দিয়ে বলি কি করে!'

ভরতের বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। পটলা তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'কাউকে আর বিশ্বাস করা যাচ্চে না, কার মনে যে কি আচে কিছু বলতে পারো না তুমি। শম্ভু, কেলেরা কি বলে জানো? বলে, আমরা শালা জান হাতে করে ওয়াগন ভাঙি, আমাদের ঘরে অভাব যায় না, আর তোমাদের তিনতলা বাড়ি ওঠে, জমি হয়, দোকান হয়...'

কথা বলতে বলতে পটলা থেমে যায়, 'তোমার শরীর খারাপ নাকি, অত ঘামচো কেন?'

সামনে কালীপুজো, তার কারবারের মৌসুম, কিন্তু ভরত যেন ঝিমিয়ে পড়ছে, সংসার তার ছোট্ট, অথচ হাজারো গণ্ডা পুস্যি, তাদের সকলের দায়িত্ব ভরতের একার। কোনো-কোনোদিন কারণে-অকারণে ক্ষেপে যায় সে, স্ত্রীকে বলে, 'চলে যেতে বলো সবাইকে, এত ঝামেলা আমি আর টানতে পারব না।'

সরোজিনী বিমূঢ় হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে—বাইরের কেউ নয়, হুট বলতে এতগুলো মানুষকে ঘর থেকে নামিয়ে দেবে! পাগল হলো নাকি লোকটা!

দুপুরবেলা সুরেনই খবরটা নিয়ে এল। ভরত খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে তখন। ও-ঘরে চাপা উত্তেজনা আর ফিসফাস তাকে উৎকর্ণ করে।

—'কি হয়েচে রে সুরেন?' ভরত চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে। কথাবার্তা ও ঘরে থেমে যায়। ভরত উঠে বসে, তার বুক ধড়ফড় করে, 'কিরে, কি হয়েচে?'

এবার স্ত্রীর গলা শোনা যায়, 'কি আবার হবে, কিছু হয়নি, তুমি ঘুমোও।'

—'কি আবার হবে? আমাকে বলা যায় না? সুরেন শোন।'

অগত্যা সুরেনকে আসতে হয়, সুরেনের সঙ্গে সুরেনের মা-ও আসে, তার পেছনে পেছনে পুত্রবধূ।

সুরেন মহা ফাঁপরে পড়ে, এমন একটা ব্যাপার, রেখে-ঢেকে বলাও যায় না, যেমন করেই বলো, কথাটার বীভৎসতা বেরিয়ে আসবেই। অতএব সমস্ত ব্যাপারটাকেই খুলে বলতে হয় তাকে :

লালবেহারী ডাক্তারের ভাই পরিমল বাজারে গিয়েছিল সকালে, বেলা বারোটা-সাড়ে বারোটা বেজে যায় তখনো সে বাড়িতে ফেরে না দেখে বাড়ির লোকজন চিন্তিত হয়—এমন সময় বিভূতি সাহার নাতিটা, বছর-দশেক বয়েস, পরিমলের বাজারের ব্যাগ নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। আঠারো-বিশ বছরের তিনটি অচেনা ছেলে ব্যাগটি পরিমলের বউকে দেবার জন্যে তাকে দেয়—ছেলেমানুষ অতশত বোঝেনি, ব্যাগ নিয়ে পরিমলের বাড়িতে যায়। বাড়ির লোকজন শাক-তরিতরকারি ভরা বাজারের ব্যাগটা উপুড় করে ঢালতেই খবরের কাগজে জড়ানো পরিমলের মাথা বেরিয়ে আসে।

সুরেনের বর্ণনা শেষ হতে না হতেই জল আন, পাখা আন—দৌড়োদৌড়ি পড়ে যায় ভরতের ঘরে।

সেই থেকে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে ভরত। বাড়িতে কেউ কারুর সঙ্গে নিচুগলায় কথা বললে ভরতের বুকের ভেতর ধড়ফড়ানি শুরু হয়। ডাক্তার বলেছে দুশ্চিন্তা করা যাবে না, রেস্টে থাকতে হবে।

ছেলে বলে, 'এত চিন্তার কি আচে তা তো বুঝি না। পরিমল পার্টি করত, আমরা তো কোনো পার্টি করি না...'

ভরত খেঁকিয়ে ওঠে, 'এই তোর বুদ্ধি! পার্টি করিস আর না করিস, তুই ভরত কোলের ছেলে, ভরত কোলে ওদের চোখে শ্রেণীশত্রু, এখন বুঝলি রে গাড়োল। রাস্তা চলিস কি চোখ বন্ধ করে!'

অতএব ডাক্তারের প্রথম নির্দেশ মানার কথাই ওঠে না—আর রেস্ট, ভরতের মতো মানুষের রেস্ট কোথায়?

ভরতের বুক ধড়ফড় করে, মাথা শূন্য মনে হয়, বাইরে বেরুলেই গলা শুকিয়ে আসে, রাস্তা হাঁটতে গেলেই মনে হয় কারা যেন তাকে অনুসরণ করছে পেছন পেছনে, ঘাড় পিঠ শিরশির করে। বাস কিংবা ট্রেনে উঠলে কোনো মানুষ তার দিকে একবার ছেড়ে দু'বার তাকালেই বুকের ভেতর ধড়াস করে ওঠে। কিন্তু উপায় কি, বাইরে ভরতকে বেরুতেই হয়।

প্রত্যেক বছরেই ভরতের বাড়িতে কালীপুজো হয়। বেশ ধুমধাম করেই হয়। এ বছরে তার একদম ইচ্ছে ছিল না। দেবীর ওপর ভক্তি উঠে গেছে নয়, পুজো মানেই উৎসব, উৎসব মানেই হৈ-চৈ আর হৈ-চৈ মানেই মানুষের দৃষ্টি পড়া। ভরত কোলে মানুষের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা, এসব কথা বুঝবেটা কে? স্ত্রী বলবে, পাগল। ছেলে বলবে, ভীমরতি। আড়ালে হয়তো বা হাসাহাসিও করবে। এমনিই সেদিন ছেলেকে গাড়োল বলাতে ছেলে রেগে আছে মনে মনে, সামনে কিছু বলেনি, মাকে বলেছে, 'কেন—ধনী কি উনি একা, আর ধনী মানুষ নেই এ তল্লাটে?'

নিজের হাতকে নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছা করে ভরতের।

সে যে চোলাই মদের কারবারী, সে যে বেআইনী ব্যাবসা করে টাকা করেছে, সমাজতন্ত্রওয়ালা একসময় যে পিটিয়েছে তাকে, আর পাঁচজন বড়ো লোকের চেয়ে মানুষের আক্রোশটা যে তার ওপরই বেশি, এসব কথাও কি ভরতকে নিজের মুখে বলতে হবে বউ ছেলেকে? যাক, যা খুশি করুক ওরা।

অতএব ভরতের বাড়িতে কালীপুজো হচ্ছে।

পুজোর দিন দুপুরে ছেলে খেতে এলে মা বলে, 'এ বেলা দোকান নাই-বা খুললি, তোর বাবার শরীর ভালো নেই, পরকে দিয়ে কি এসব কাজ হয়।'

সুরেনের ভেতর তখন আসন্ন ফুর্তি বুজকুড়ি মারছে। আজ সন্ধ্যায় বহুদিন পর বন্ধুদের সঙ্গে একটু গা এলানো মৌতাত করা হবে।

সুরেন তাড়াতাড়ি বলে, 'না না, দোকানে যেতেই হবে, ক'টা জরুরি অর্ডার ডেলিভারি দিতে হবে, দোকান বন্ধ রাখলে খদ্দের বিগড়ে যাবে।'

এরপর সরোজিনীর কিছু বলার থাকে না।

ছেলে দোকানে যাওয়ার সময় সরোজিনী বলে, 'তাড়াতাড়ি ফিরিস, যাবার সময় ভক্তি করে প্রণাম করে যাস—কি যে সব হয়েচিস তোরা আজকালকার ছেলেরা, ঠাকুর-দেবতার ওপর এক ফোঁটা ভক্তি নেই।'

ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল সুরেনের। অনেকদিন পর বড়ো আনন্দে কাটছিল আজ। অনেক দিনের স্মৃতি জড়ানো টিনের চালের ক্লাব ঘরটায়—গান, হাসি, গল্পগুজব, তার ওপর নিপু খাঁটি স্কচ জোগাড় করে এনেছিল, কষা মাংসের সঙ্গে বড়ো জমেছিল। যাত্রা-থিয়েটার করে বেড়ানো সময়গুলোতে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এক-আধ চুমুক খেয়েছে সুরেন, তা-ও দিশি। ভালো লাগেনি। দোকানের ঘানিতে বাধা পড়ার পর একদিনও হয়নি। বিয়ের পর তো একেবারে জাবরকাটা গরু। আজ বিলিতি মাল পেটে পড়ায় ভারি চনমনে হয়ে উঠল মেজাজটা। সেই পুরনো নির্ভার ফুরফুরে সময়টার বার্তা বইতে শুরু করেছিল। আর তখন হঠাৎ করে সবিতার কথা মনে হতেই বুকের ভেতর কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। বন্ধুদের কথাবার্তায় সে মনোযোগ রাখতে পারছিল না, নিজেকে খুব হেরে যাওয়া মনে হতে থাকে—মনে হতে থাকে তার জীবনটা একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। মনে হলো, বড়ো ঠকিয়েছে তাকে সবাই। বাপ-মা তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একেবারে ফিনিশ করে দিয়েছে তাকে।

সবিতার জন্যে তার প্রচণ্ড রকমের মায়া হতে থাকে। সবিতার ওপর সে জুলুম করেছে, বড়ো অবিচার করেছে সে। নিজের কাপুরুষতার জন্যে সবিতার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে।

—'কি রে, উঠে পড়চিস যে বড়ো?' বন্ধুরা সমস্বরে হৈ-হৈ করে ওঠে।

—'না চলি, ভাল্‌লাগচে না।' একটু একটু জড়ানো ভারি গলায় সুরেন বলে।

—'লে বাবা, অমন খাঁটি স্কচ খাওয়ালুম, তাও ভালো লাগচে না! কেন—ভরতেশ্বরী ছাড়া রোচে না বুঝি আজকাল?'

বন্ধুরা হো হো করে হেসে ওঠে। সুরেন লাল হয়ে যায়। নিপু স্পষ্ট তার বাপের চোলাই মদের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। মাখন বলে, 'আরে না না, মনে মনে হৃদয়েশ্বরীর ডাক শুনতে পেয়েচে! তাই নয় রে সুরেন?'

আবার হো হো হাসি। সুরেন প্রায় ছিটকে বেরিয়ে আসে বাইরে। কেমন আচ্ছন্নের মতো হাঁটতে থাকে সে।

নোনা পোতার রেলগেটের পাশে পুজো হচ্ছে। ভিড় তেমন নেই, তবু মেয়ে-দেখা মাস্তান দু'চারজন এখনও বড়ো জমিয়ে আছে। চালচিত্রের পেছনে রেলের পুকুরপাড়ে হয়তো বোতল চলছে। ঝাঁ ঝাঁ করে লাউড স্পীকার বাজছে 'এপ্রিল ফুল বানায়া...।' পাতলা ভিড়ের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে ওঠে—সাড়ে দশটা!

মা সকাল সকাল ফিরতে বলেছিল। বাবা হয়তো অস্থির হয়ে পড়েছে। বিনু ছটফট করছে নিশ্চয়ই। সুরেন জোরে জোরে পা চালায়। একবার ভাবে রিক্সা

নিই, তারপর হঠাৎ মনে হয় : কেন, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম নেই? আমার খুশি, আমি দেরি করব! প্রায় ছেলেমানুষের মতো গোঁ ধরে হঠাৎ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর আবার হাঁটতে থাকে ধীরে ধীরে। সবিতার সঙ্গে সে মনে মনে কথা বলতে থাকে, 'সবিতা, আমি খুব অন্যায় করেছি, আমায় ক্ষমা করে দাও সবিতা!' বলতে বলতে সে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সবিতার পা জড়িয়ে ধরার জন্যে রাস্তার ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে যাচ্ছিল। পেছনের চলন্ত সাইকেল থেকে কে যেন ডেকে ওঠে, 'কে— সুরেনদা নাকি?'

সুরেন ফিরে তাকাবার আগেই সাইকেল তাকে অতিক্রম করে যায়। হাতকয়েক দূরে গিয়ে সাইকেল আরোহী পেছন ফিরলে সুরেন চিনতে পারে, 'কে, ঝন্টু?'

—'হাঁ, চলি!'

ঝন্টু চলে যায়। সুরেন পেনো বাজারের মোড় পেরোয়। রাস্তাটার এখানে আবছা অন্ধকার। এখান থেকে বাড়ি ঘর ফাঁকা ফাঁকা। দু'পাশের গাছপালা নুয়ে আছে। সুরেন আর একটা বাঁক পেরোয়। পানু স্যাকরার ভাঙা বাড়ির ধার ঘেঁষে, নন্দীদের পুকুরপাড়ের নিচে দিয়ে রাস্তাটা ক্রমে সরু হয়ে গেছে। তারপর দু'পাশে ব্রজ তাঁতির বিশাল বাঁশ বাগান।

সুরেন রাস্তায় কোনো মানুষ দেখে না, বাঁশ বাগানের খুব ভেতর থেকে শিয়াল ডেকে ওঠে, ঝিঁঝির একটানা মন্ত্রোচ্চারণ চলে চারপাশে। সুরেনের কেমন গা ছমছম করতে থাকে। পা ভারি হয়ে এসেছে। হাত দুটোও তার অন্য কারো হাত হয়ে গেছে।

হঠাৎ দেখে, সামনের বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় সবিতা দাঁড়িয়ে আছে। সুরেন আকুল হয়ে ডাকে : 'সবিতা!' সবিতা তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েই সামনে ঝুঁকে দু'হাতে মুখ ঢাকে। সুরেন দ্রুত হাঁটতে যায়, পা জড়িয়ে আসে। সবিতা পিঠে চুল এলো করে দৌড়োতে থাকে।

'সবিতা, শোনো সবিতা!'

তার মোটা খসখসে ভারি হয়ে যাওয়া জিভে শব্দ ফোটে কি ফোটে না, সুরেন গোঙানির মতো করে গোপী দত্তর মেয়েকে ডাকে।

মেয়েটি হঠাৎ কোথায় যে লুকোয় সুরেন ঠাহর করতে পারে না। ঝিঁঝির ডাক আর বাঁশ বনের শোঁ শোঁ কট কট শব্দ, শুকনো বাঁশপাতার ওপর পোকামাকড় হেঁটে যাওয়ার কি তার পায়ের নিচে ভেঙে যাওয়া পাতার শব্দ— বাকিটা সুনসান নির্জনতা। সবিতা কি শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এল! সুরেন হাঁটতে হাঁটতে খোঁজে। স্বামীটা লিলুয়া ওয়ার্কশপে চাকরি করে। শ্বশুরবাড়িতে হয়তো কষ্ট দেয় সবিতাকে। হয়তো স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। সুরেনের

মাথার ভেতর মেঘ আর চাঁদের খেলা চলে। একবার আলো হয় একবার ঝাপসা হয়। অক্টোবরের কুয়াশাময় রাত্রিতে আকাশের চাঁদটি কোথায় আছে মাথার ওপর বাঁশ বাগানের ছাউনির নিচে থেকে দেখা যায় না, শুধু একটু ময়লা ময়লা আলো অন্ধকারের সঙ্গে মিশে নষ্ট ডিমের মতো ঘোলা হয়ে আছে চারপাশে।

কী যে ঝামেলায় পড়ল সুরেন! একটাও কি মানুষ আসতে নেই! সবিতা যদি এখন এই বাঁশ বাগানের ভেতরে কোথাও একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে।

ওই, ওই তো সবিতার আঁচল দেখা যাচ্ছে। সুরেন দৌড়োতে শুরু করে। এঁকেবেঁকে টাল খেতে খেতে দৌড়োয় : 'সবিতা, দাঁড়াও, সবিতা প্লিজ!' তার জিভ কৈ মাছের মতো ছটফট করে মুখের ভেতর। চোখে জল এসে যায়। মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় সুরেন, নিজের শরীর নিজের কাছেই প্রকাণ্ড ভারি বোঝার মতো ঠেকে, কিছুতেই তুলতে পারে না, হাঁটু দুটির ভেতরকার টানটান বাঁধনগুলো সব আলগা হয়ে গেছে। তার ওপর ভর দিয়ে কোনোমতেই ওঠা যায় না। সুরেন দামাল শিশুর মতো হামা দেয়। হাত কয়েক দূরে গিয়ে উবু হয়ে বসে। মাটির ওপর দু'হাতের ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে বার দুই দোল খেয়ে উঠতে গেলে তার মাথা চক্কর দেয়, পেটে কষা মাংস আর নিপুর খাঁটি স্কচ ডিগবাজি খেলা দেখায়। বুক বেয়ে নোনতা ঝাঁঝালো স্বাদের ঢেঁকুর এবং জল উঠে আসে মুখে। সুরেন ওয়াক ওয়াক করে, বমি হয় না, থু থু করে থুতু ফেলে, মুখ হাঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস টানে। খানিকক্ষণ থম ধরে চোখ বন্ধ করে বসে থেকে তেমনি দু'হাতের ওপর ভর দিয়ে প্রবল হ্যাঁচকা টানে নিজেকে উপড়ে নেওয়ার মতো ক'রে দাঁড় করিয়ে দেয়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জেগেছে। সুরেন প্রাণভরে শ্বাস টানে, তারপর আবার হাঁটতে থাকে।

ব্রজ তাঁতির বাঁশ বাগানের শেষ মাথায় এসে পড়েছে। বাঁকের মুখে বটতলাটা দেখা যায়, তারপরেই জেলেপাড়া। আচ্ছা আমি এ রাস্তায় এলাম কেন? বটতলার নিচে দিয়ে জেলেপাড়ার ওধার দিয়ে আমার সোজা চলে যাওয়ার কথা। মাইরি, এ-সবের কোনো মানে হয় না—সুরেন নিজেকেই শোনাতে শোনাতে হাঁটে।

বটতলায় আঁশশ্যাওড়ার জঙ্গলের ভেতর চারজন অস্থির হতে থাকে। হরি বলে, 'কি হলো বলতো, ঝন্টে তুই দেকিচিস?'

—'লে শালা, কথা বললুম!'

সুদীপ বলে, 'বোকাচোদাটা গেল কোতা তা হলে?

—'আমার মনে হয় বাঞ্চোতটা রাস্তার ধারে কোথাও পোঁদ উল্টে পড়ে আচে।' ঝন্টু যুক্তি দেখানোর মতো করে বলে।

উঁচু বটতলার নিচে দিয়েই পাকা রাস্তা ধরে ভরত কোলের লোকজনেরা একটু আগে আলো হাতে কথাবার্তা বলতে বলতে স্টেশনের দিকে গেছে। হরি কোনো কথা বলে না, গলা উঁচিয়ে স্টেশনমুখী রাস্তার দিকে বারবার তাকায়।

অনাদি এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি, সে বলে, 'আচ্ছা হরি, এমনও তো হতে পারে, মাতাল শালা রাস্তা ভুল করে বাঁশ বাগানের ভেতর ঢুকে ঘুরপাক খাচ্ছে।'

এবার তিনজনই এক সঙ্গে অনাদির দিকে তাকায়। তাদের মাথায় আলো চমকে ওঠে। হরি বলে—'ভেরি ন্যাচারাল। অনা তোর কথাই ঠিক, নেশা করেছে, ঝন্টে নিজে দেকে এসেছে, মাতাল মানুষ। মোড়ের মাথায় এসে দিক ঠিক করতে পারেনি—পানু স্যাকরার বাড়ির পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে নন্দীদের পুকুর ধার দিয়ে সোজা ব্রজ তাঁতির বাঁশ বাগানে ঢুকেছে, রাইট! ঝন্টে, তুই রাস্তার দিকে নজর রাক্, আমরা বাঁশবাগানে ঢুকি'...

অনাদি বলে—না, ঝন্টে শুধু শুধু এখানে বসে থেকে লাভ কি! রাস্কেলটা যদি রাস্তার ওপরই পড়ে থাকে তাহলে ভরত কোলের লোকজন গেছে তারাই সঙ্গে করে নিয়ে আসবে, অতগুলো মানুষকে ঝন্টু একা সামলাতে পারবে না, খামোখাই সব কাজ গুবলেট হবে। ঝন্টু—তুইও চল।

চারজন যুবকের একজনের হাতে চটের একটা ব্যাগ, তারা সতর্ক হয়ে রাস্তায় নামে তারপর এক দৌড়ে পাড়-উঁচু বাঁশ বাগানে উঠে দ্রুত নিজেদেরকে আড়াল করে ফেলে।

হাঁটতে হাঁটতে সুরেন আবার সবিতাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে সামনের দিকে এগোয়।

বাঁশপাতার ওপর খড়মড় আওয়াজ এবং ধুপধাপ পদশব্দে চারজনই সামনের দিকে তাকালে টলমল পায়ে এগিয়ে আসা সুরেনকে দেখতে পায় ; চাপা সোল্লাসে তারা সুরেনকে অভ্যর্থনা জানানোর মতো করে বলে, 'আরে শালা। গোপাল তুমি এখানে!'

যেন মজাদার কিছু। তারা সুরেনের সামনে এসে দাঁড়ায়। চারটে ড্যাগার সুরেনের পেট থেকে বিঘত-খানেক দূরে অর্ধচন্দ্র-করে ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় সুরেন! সবিতার বদলে মাটি ফুঁড়ে চারজন এমনভাবে ছুরি হাতে সামনে দাঁড়িয়ে, তার ওপর অতি পরিচিত। বড়ো বড়ো চোখ করে মানুষ চারজনকে দেখে। কোনো কথা বলতে পারে না, ব্যাপারটা বড়ো ঘোলাটে ঠেকে—সবিতাকে দেখতে পাওয়াটা ঠিক, না এরা ঠিক?

তার ব্রহ্মতালু দিয়ে স্কচ হুইস্কির উত্তপ্ত ফ্লেবার বেরিয়ে যেতে থাকে হু হু করে।

কী যে হয় সুরেনের ভেতরে কে জানে, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ সে 'বাঁচাও বাঁচাও' ব'লে পেছন ফিরে দৌড়োতে যায়।

ঝন্টুর ড্যাগারই তার পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করে প্রথম। সুরেন 'আ-আ-আ' করে বিকট শব্দে মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে। হরি, সুদীপ, অনাদি তাকে ঘিরে ধরে—'খবরদার, চেঁচাবিনি শালা!'

চটের ব্যাগের ভেতর থেকে সুদীপ পটকা বার করে ফাটায়।

ছুরির ঘাইটা তেমন জমেনি পিঠে। সুরেন থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কান্না-ভাঙা গলায় বলে, 'আমায় মারিসনি, প্লিজ, তোদের পায়ে পড়ি, আমার বউয়ের বাচ্চা হবে।'

তাকে না মারার যুক্তি হিসেবে সুরেন কেন যে তার বউয়ের বাচ্চা হওয়ার কথা নিয়ে এল কে জানে।

হরি বলে, 'তাই নাকি? ঝন্টে, তাহলে তো শালার যন্তরটাই সাবড়াতে হয় আগে!'

সুদীপ তার মুখে রুমাল গুঁজে দেয়, তারপর তিনজন মিলে তাকে চিৎ করে। সুদীপ রুমাল চেপেই থাকে। হরি আর অনাদি সুরেনের দুই হাতের ওপর দাঁড়ায়।

ঝন্টু বলে, 'আর একটু ওধারে নিয়ে যাই চল।' তখন তিনজন মিলে সুরেনকে চ্যাং দোলা করে তোলে। সুরেন মোড়ামুড়ি করে। তার আমড়া আমড়া চোখ দুটি বেরিয়ে আসে। সুদীপ মুখের ভেতর রুমাল ঠেসে ধরে থাকে, তার ভেতর থেকে খুব ঘষা অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে সুরেন।

যুবক চারজন ভারি হাস্যকর কায়দায় তাকে বাঁশবাগানের পায়ে-চলা সরু রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে পাশে—আরো ভেতর দিকে একটা বড়ো ঝাড়ের আড়ালে নিয়ে গিয়ে ফেলে।

হরি বলে, 'তাড়াতাড়ি কর, শালা যে জোর চেঁচিয়েচে!'

আবার তারা আগের পজিশন নেয় ; হরি আর অনাদি সুরেনের দুই হাতের ওপর, সুদীপ মুখে রুমাল চেপে।

ঝন্টু সুরেনের দুই হাঁটুর ওপর বসে ধুতি খোলে, ড্যাগার দিয়ে দড়ি কেটে আণ্ডারওয়্যার নামিয়ে দেয়।

সুরেন গলার দু'পাশের শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে, কিন্তু তার টাকরা পর্যন্ত ঠাসা রুমাল, আওয়াজ বেরোয় না, খুব ক্ষীণ হাওয়া বেরোবার অদ্ভুত একটা আওয়াজ হতে থাকে, ক্রমাগত সে মাথা এপাশ ওপাশ করে। হাত টানে। ওপর নিচে কোমর নাড়ে। ঝন্টু আর একটু সামনে এগিয়ে উরুর ওপর আরো চেপে-চুপে বসতে বসতে বলে, 'হাঁ হাঁ, শালা চিৎ হয়ে মনে মনে বউকে ঠাপা।'

বাম হাতে সে সুরেনের কুঁকড়ে যাওয়া শিশ্ন মুঠো করে ধরে ইলাস্টিকের মতো টেনে লম্বা করে, তারপর ডান হাতের ড্যাগার দিয়ে পোঁচ দেয়। বেশি দিতে হয় না, গোটা দু'য়েক পোঁচেই কাজ হয়। তীক্ষ্ণমুখী রক্তধারা পিচকারি দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয় কি হয় না, সুদীপ সুরেনের ধুতির খুট দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে। ঝণ্টুর মুঠোর ভেতর সুরেনের লিঙ্গ কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে।

প্রধান কাজটা হরিই করে। তার জন্যে তার পজিশন চেঞ্জ করতে হয়, হরি সুরেনের বুকের ওপর চড়ে বসে। সুরেনের পুরুষাঙ্গ হাতে নিয়ে ঝণ্টু হরির জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়।

সুরেন এখন আর তেমন দাপাদাপি করে না, শুধু একটানা ক্ষীণ গোঙানি আর কোমরের মৃদু মৃদু কাঁপন, কখনো এ-পা কখনো ও-পা একটু-আধটু টানে। চোখ স্থির। হয়তো-বা সুরেনের অজ্ঞান অবস্থায়ই হরি তার গলায় ছুরি চালায়। কেননা প্রথম পোঁচ দেবার পর একটু আগে চুপচাপ পড়ে থাকা সুরেন বেশ জোরে সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে নড়ে ওঠে। পরের পোঁচগুলোয় আর তেমন নড়ে না। সুরেনের গলা দিয়ে রক্তপ্রবাহের ঘড়ঘড় শব্দ হতে থাকে—হরি কর্ম সমাধা করে উঠে দাঁড়ায়।

হরির অ্যাকশন চলাকালে অনাদি বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদটাকে খুঁজছিল। ঝণ্টু এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল, সুরেনের হাতের ওপর দাঁড়িয়ে বার বার সেই ছবিটাই চলে আসছিল তার মনে : রাস্তার ওপর টলমল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সুরেন জিজ্ঞেস করছে, 'কে, ঝণ্টু?'

হরি হাঃ বলে মুখ থেকে সনিঃশ্বাস শব্দ করে উঠে দাঁড়ালে ঝণ্টু নেমে আসে। অনাদি একটু দূরে গিয়ে প্রস্রাব করতে বসে। সুদীপ উঠে আড়মোড়া ভাঙে। ততক্ষণে ঝণ্টু একটা শুকনো কঞ্চি কুড়িয়ে নিয়ে তার আগায় সুরেনের কর্তিত লিঙ্গটি গাঁথে, তারপর সুরেনের দুই ঊরুর মাঝখানে কঞ্চিটাকে পুঁতে দেয় মাটিতে।

সুদীপ বলে, 'মাইরি যেন শিবের ত্রিশূল। থাক। বেশ হয়েচে!'

এবার তারা ব্যাগের ভেতর থেকে একটি বড়ো সাইজের পটকা এবং ইঞ্চিচারেক চওড়া ও হাতদেড়েক লম্বা কাগজ বার করে। 'গলা কাটা চলছে চলবে' শ্লোগান সম্বলিত সেই লম্বা কাগজটি বিশ্বসুন্দরীর মতো করে সুরেনের ডান কাঁধ থেকে বুকের ওপর দিয়ে বাম কোমর পর্যন্ত প্রসারিত করে বিছিয়ে দেয়।

এই জরুরি কাজটি শেষ করে তারা পটকা ফাটিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়।

লিঙ্গহীন, জবাই করা, বাণীশোভিত উলঙ্গ সুরেন ঘড়ি হাতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকে বাঁশবাগানের ভেতর। তার দুই ঊরুর মাঝখানে কঞ্চিতে গাঁথা ঊর্ধ্বমুখী শিশ্নটিকে বড়ো নিঃসঙ্গ দেখায়।

জেলেপাড়ার লোকগুলো ঘরের ভেতর উঠে বসে কান খাড়া করে। তারপর দরজা খুলে বাইরে রকের ওপর বেরিয়ে আসে। এ-রক ও-রক থেকে মানুষ কথা বলে : 'ব্রজ তাঁতির বাঁশবাগান থেকে নয়?' আর একজন বলে, 'তাইতো মনে হলো।'

নিতাই জেলের যুবক ছেলেটি বলে, 'কেষ্টো কাকা, ব্যাপারটা একটু দেখতে হয় না?'

বৃদ্ধ নিতাই ধমকে ওঠে : 'হাঁ দেখতে হবে বৈকি?' হারিকেনের আলোয় তার মুখের চামড়ার কোঁচকানো ভাঁজগুলো কেঁচোর মতো কিলবিল করে ওঠে : 'রাত দুপুরে প্রাণটা হারাও আর কি!'

বৃদ্ধের এ-কথায় মানুষগুলোর মাথার ভেতর লালবেহারী ডাক্তারের ভাই পরিমলের গলাকাটা লাশটা ধপাস করে এসে পড়ে।

রাত সাড়ে বারোটার দিকে নতুন বাঁশের খাটিয়ায় শুয়ে মানুষের কাঁধে চড়ে সুরেন বাড়ি ফেরে। পুকুরপাড়ে মণ্ডপের সামনে ছোটোখাটো মাঠের মতো জায়গাটা খালি হয়ে গিয়েছিল, ঢাকিরা বসে বসে বিড়ি টানছিল, দূর থেকে মানুষের কলরব ও বাঁশের খাটিয়া দেখে তারা আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে লোকজনে ভরে যায় জায়গাটা। সুরেনের অনুসন্ধানকারীরা স্বেচ্ছাসেবকের মতো খাটিয়ার চারপাশে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেকাতে থাকে। চিৎকার করে হাত নেড়ে স্থির হতে বলে। কিন্তু কেউ কারুর কথা শোনে না। মেলার মতো ক্রমাগত বিপুল জনসমাগমের ভিড়, হৈ-চৈ, চিৎকার আর দৌড়াদৌড়ির মধ্যে সুরেনকে মণ্ডপের একপাশে নামালে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিরোধ ভেঙে যায়। মানুষজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে, 'নেপাল ইদিকে আয়', 'মাথাটা একটু সরাও না', 'ইস' ইত্যাকার ধ্বনি শোনা যেতে থাকে, কেউ কেউ একপলক দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলে, মানুষজন ঠেলে বেরুবার জন্যে ছটফট করে—এই সবের মধ্যেও ভিড়ের চাপ বাড়তে থাকে।

জেলেপাড়ার দু-একজন একধারে দাঁড়িয়ে তাদের বীরত্ব কাহিনী বর্ণনার তোড়জোড় করছিল, তাদেরকে থেমে যেতে হয়। সামনে এমন তাজা বীভৎসতা ফেলে কে তাদের শুকনো বর্ণনা শোনে!

ফলে মানুষ ক'জনের কিছুই করার থাকে না। ভূমিকাহীন অসহায় হয়ে তারা এদিক-ওদিক তাকায়। ওদিকে মণ্ডপের ভেতর টিনের খাঁড়া হাতে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা দেবীকে সঙের মতো মনে হয়।

ভরত কোলের বাড়ির ভেতর ততক্ষণে বিলাপ আর হৈ-চৈয়ের মধ্যে

সুরেনের মা ও তার পোয়াতি বউয়ের অজ্ঞান মাথায় জল ঢালা শুরু হয়ে গেছে।

সদর দরোজার সামনে সুরেনের অনুসন্ধানকারী দলটির একাংশ ও পাড়া-প্রতিবেশীরা ভরত কোলেকে ঘিরে ধরেছে। সেই ভিড়ের ভেতর ভরত কোলের ভাঙা গলার কান্না এবং ধস্তাধস্তিতে তার মাথা, হাত, খালি গা এবং ধুতির কিছু অংশ চমকে ওঠে।

হঠাৎ দেখা যায় শিকল-ছেঁড়া উন্মাদের মতো হা হা রবে ভরত কোলে দৌড়ে আসছে। তার পেছনে পেছনে আরো কিছু মানুষ।

সুরেনের লাশকে ঘিরে ভিড়, ঠেলাধাক্কা এবং হৈ-চৈ রত কয়েক শ' মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়ে যায়। জায়গাটায় হঠাৎ করে নিঃশ্বাসরুদ্ধ স্তব্ধতা নেমে আসে। মধ্যরাত্রির উন্মুক্ত আকাশতলে সেই স্তব্ধতার মধ্যে শোকোন্মত্ত পিতার 'বা বা সু রে ন রে' এই ত্রিভুবন ভাসানো সর্বভেদ্য হাহাকার ও তার বিপুল বেগে ধেয়ে আসা—খালি গায়ের ছোটোখাটো গোলগাল মানুষটিকে অবর্ণনীয় বিশালত্ব এনে দেয়।

ভরত কোলে মণ্ডপ অভিমুখে আসতে থাকে। কাছাকাছি এসে হ্যাজাকের আলোয় তার ধ্বসে যাওয়া অশ্রুময় মুখমণ্ডল চকচক করে।

ঝুলন্ত হ্যাজাক দুলিয়ে, বিশাল দিগম্বরী নৃমুণ্ডমালিনী কালীমূর্তির সামনে ভরত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার মতো করে আছড়ে পড়ে : 'আমায় কেন নিলি না মা, আমায় কেন নিলি না।'...কোষাকুষি ছিটকে পড়ে, মাটির ঘট ভেঙে জল গড়াতে থাকে, ফুল বেলপাতা পিষ্ট হয়; প্রৌঢ় ভরত দেবীর পদপ্রান্তে মাথা ঠোকে : 'আমি মহাপাপী...আ মি ম হা পা পী-ই-ই'...ভরত কোলে মাথা দোলায় : 'আমিই রক্তবীজ মা, আমিই অসুর...আমিই অসুর...ও হো হো হো হো...আমায় কেন'...তার কণ্ঠস্বর ভেঙে চুরমার হয়ে যায় 'বা বা সু রে ন রে-এ-এ-এ...ও হো-হো-হো-হো...'

মানুষ, নিসর্গ, রাত্রিকাল—সমস্ত চরাচরকে ছিন্নভিন্ন করে এই লবণাক্ত চিৎকার মহাশূন্যতায় মিশে যেতে থাকে।

১৯৮৮